কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়

১৫০ বছর পূর্তি

কাকিনা মাহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়

কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালনিরহাট

কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়।

18/02/2011 06:11

অনলাইন ভার্সনঃ সমন্বয়কের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর লাখো কোটি শুকুর অবশেষে আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কাকিনা মাহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাময়িকী "সার্ধ শতাব্দীর মহিমা"র অনলাইন সংস্করন বের করতে সক্ষম হলাম।এই স্কুল নিয়ে আমার/আমাদের গর্বের শেষ নেই। এর সবকিছুই আমার/আমাদের প্রানের চেয়েও আপন মনে হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ চিন্তা করছিলাম কাজটা করার, চেয়েছিলাম যাতে যেদিন আমরা বেঁচে থাকবো না সেদিনও যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে আমাদের সমৃদ্ধ অতীত সম্পর্কে, আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেট এর যুগ। ইন্টারনেটের এই কপি সবার কাছে ছড়িয়ে যাবে- এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় রাফি ভাইকে (বুয়েট) যিনি লেখাগুলো দিয়ে সাহায্য করেছেন অন্যথায় এই অনলাইন সংস্করন কখনোই হতো কিনা সন্দেহ! কৃতজ্ঞতা যারা এই লেখাগুলো টাইপ করেছেন। প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই তাদের। ধন্যবাদ জানাই সকল স্যারদেরকে,সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের যারা এই সাময়িকী ও অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ধন্যবাদ সকল শুভানুধ্যায়ীবৃন্দকে।

হয়ত পাতাগুলোর সমন্বয় ঠিকমতো হয়নি। ভুল মাফ করবেন। পরবর্তীতে এই ভুলগুলো সংশোধনের আশা রাখি।

কাকিনা মাহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে এই কামনায়।

জাহিদ ফারুকী
ইউনিভার্সিটি তেনেগা ন্যাশনাল
মালয়েশিয়া
২৮মে '১২

বানী
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
প্রাচীন এই বিদ্যাপীঠের ১৫০ বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজন সবার জন্য এক আনন্দ সংবাদ।
এ উপলক্ষ্যে আমি এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি অনেক সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আগামী দিনেও প্রতিষ্ঠানটির এই ধারা অটুট থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
আমি প্রতিষ্ঠানটির ১৫০ বছর পূর্তি উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংল-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

স্বাক্ষর

বানী

মাননীয় বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী

সুদীর্ঘকাল থেকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়। ঐতিহ্যবাহী কাকিনায় অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব আয়োজনের সংবাদ জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের উত্তর জনপদের খ্যাতিমান এই শিক্ষায়তনের সাবেক ও বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আগামী দিনেও প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি কামনা করি খ্যাতিমান মানুষ গড়ার এই প্রতিষ্ঠানটির ১৫০ বছর পূর্তি সফল ও সার্থক হোক।

জয় বাংল-জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

স্বাক্ষর

বাণী

মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় চলমান ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যয়। এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমাদেরকে অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক ও খ্যাতিমান মানুষ উপহার দিয়েছে।
সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের আয়োজন আমার জন্য এক আনন্দ সংবাদ।
এই উপলক্ষ্যে আমি এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে যারা অতীত থেকে আজ পর্যন্ত সম্পৃক্ত তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি কামনা করছি আগামী দিনেও প্রতিষ্ঠানটি তার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল থাকবে। আমি বিশ্বাস করি এই বিদ্যাপীটের সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে।
জয় বাংল-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী

স্বাক্ষর

শুভেচ্ছা বানী

কবি শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর জন্মস্থান কাকিনা উত্তর জনপদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল যার আছে গৌরবময় অতীত। কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়টি এই জেলার একটি প্রাচীন ও স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সভ্যতা বিনির্মাণে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে কালের আবর্তে ১৫০ বছর অতিক্রম করেছে এ প্রতিষ্ঠান। দেশ ও জাতির জন্য কৃতি সন্তান ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তুলতে এর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমার প্রজন্মের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল ইতি কথা তুলে ধরে ইতিহাস সৃষ্টিতে তাদের অনুপ্রাণীত করতে এ আয়োজনের কথা শুনে আমি আনন্দিত।

আয়োজকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আয়োজন সফল হোক। গৌরবময় ইতিহাসে মজবুত ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে অম্লান আলোক শিখায় উদ্ভাসিত করুক বর্তমান প্রজন্মকে এবং প্রদীপ্ত হোক অনাগত ভবিষ্যৎ– এটা আমার প্রত্যাশা।

মো: আলাউদ্দিন ফকির
জেলা প্রশাসক
লালমনিরহাট।

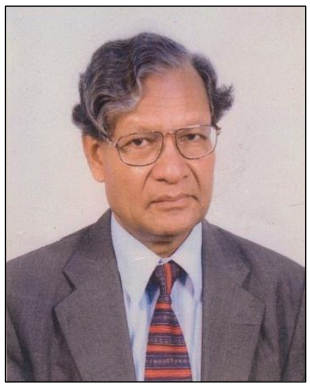

সভাপতির বাণী

কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের দেড়শত বর্ষ উদ্‌যাপনে অংশ নিতে পেরে আমি গৌরবান্বিত। এই বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষার ভিত্তি তৈরী হয়েছিল। তাই এই সুযোগে বিদ্যালয়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত সব গুণীজনদের শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ স্মরণ করছি। আরও স্মরণ করছি আমার সব সহপাঠী ও অন্যান্য সব ছাত্র-ছাত্রীদের - যাদের সাহচর্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কাকিনা রাজ পরিবারের বিশেষ ভূমিকাকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাই - তাদের এই অবদান আমাদেরকে ঋণী করে রেখেছে।

এই অনুষ্ঠান আয়োজনে দেড়শত বর্ষ উদযাপন কমিটির আমার সব সহযোগীবৃন্দের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে ওনারা সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং এজন্য বিশেষ করে ওনাদেরকে আমার নিজের ও এলাকাবাসীর তরফ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

সকলের প্রত্যাশা মতো অনুষ্ঠানটি হয়তো আরও সার্থক হতে পারতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই মহা উৎসব বিদ্যালয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে – এই আশা করছি।

বিদ্যালয়ের আগামী শতবর্ষ অনেক সুন্দর ও সার্থক হোক আজকের এই মহান উৎসবে এই আমার একান্ত কামনা।

সভাপতি
১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটি,
কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়।

দুটি কথা

দেড়শ' বছর পূর্তি উদযাপনের আনন্দে আজ উদ্বেলিত কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে আমরা গর্বিত যে এমন এক মহতী অনুষ্ঠানে আমরা শরীক হতে পেরেছি।

আমাদের এই প্রিয় বিদ্যাপীঠের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মহিমারঞ্জন প্রাঙ্গণ আজ মহামিলনে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

আজকের এই নবীন প্রবীণের মহামিলন প্রতিবছর ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা করছি।

এই আয়োজনের সকল ত্রুটির জন্য সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। এ সঙ্গে মহতী এই আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বীরেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান শিক্ষক/সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)
কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট

সম্পাদকীয়

সার্ধ শতাব্দীর গৌরব গাঁথা

কাব্যের কাকিনা। এর প্রকৃতি ও মানুষ সবই যেন কাব্যময়। ইতিহাস, ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই পাদপীঠে স্থাপিত সাত পুরুষের বিদ্যাপীঠ কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সার্ব শতাব্দীর গৌরবগাঁথা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে স্মরণিকা। ১৮৫৯ সালে মহাত্ম শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরী এটা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার উত্তরাধিকারী রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ও রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরীর আমলে নতুন নামে নব নব উদ্যমে আরো বিকশিত হয়ে উঠে এই বিদ্যাপীঠ। যার সাফল্য গাঁথা এই স্মরণিকার বিভিন্ন নিবন্ধ ও স্মৃতি কথায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

এমন এক মহতী প্রতিষ্ঠানের স্মরণিকা প্রকাশের দায়িত্ব আমাকে প্রদানের জন্য আমি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক-পরিচালনা কমিটিকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি রাব্বুল আলামিনের দরবারে আদায় করছি হাজার হাজার শোকরিয়া।

এটি আমারও স্কুল। এই বিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে আমার জীবনের ভীত। পিতা-মাতা গুরু ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঋণ কে পারে শোধ দিতে। এরপরও এই স্মরণিকার দায়িত্ব পাওয়ার মধ্য দিয়ে এই ঋণ আরো বেড়ে গেল।

এই স্মরণিকা প্রকাশের দায়িত্ব আমার হলেও এর প্রতিটি শব্দ ও বাক্যে এবং প্রতি পাতায় পাতায় যার স্নেহের পরশ মিলেমিশে রয়েছে তিনি অধ্যাপক আবদুস সালাম। তার সদা পরামর্শ এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। একজন মুরুব্বী কত উদার সহনশীল, স্নেবৎসল হতে পারে এবং কত সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন তার উপমা কেবলই তিনি।

আর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম মিলে মিশে আছে এই স্মরণিকায় তাদের মধ্যে রয়েছেন মোঃ আতোয়ার আলী। এহনসান লাইজু, আলমগীর বাদশা, কবির, হুমায়ুব কবির বাবু, লিটন, ফারুক ও আরো অনেকে। হাফিজুর রহমান লাবলুর একেই যাবে। দেড়শ' বছর উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোহাম্মদ হাসানের এটাও একটা দায়িত্ব ছিল সংকলনটির যথাসময়ে প্রকাশনা নিশ্চিত করা। কিন্তু সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে তার আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করতে হবে।

আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো সংকলনটি। তবে যথাযথ যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহের ঘাতির কারণে যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা এমন আরো অনেক অজুহাত দাঁড় করানো যাবে। তবে কোন অজুহাতেই এ অসম্পূর্ণতার দায় এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

উপস্থাপনা ও মুদ্রণগত ত্রুটি রয়েছে। এই সব অর্থাৎ স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সব ত্রুটির অসম্পূর্ণতার দায় অমি অকপটে স্বীকার করছি। এ দায় থেকে মুক্তির রাস্তা হচ্ছে সবার ক্ষতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। সবাই নিজ মহৎ গুণে ত্রুটিগুলো আমাদের হিসেবে বিবেচনা করে নেবো এই কামনা করছি।

কাব্যিক এই কাকিনার প্রাকৃতির মত উদারতাই পারে কেবল আমাকে এদায় থেকে মুক্তি দিতে। কেবল এটুকু কামনা করছি।

মো? সিরাজুল ইসলাম

এক নজরে স্কুল

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সাহিত্যের পীঠস্থান কবি শেখ ফজলল করিম-এর স্মৃতি বিজড়িত কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় আজ দেড়শ' বছরে পদার্পণ করছে। জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৫৮ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে বিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর হয়। স্কুলের এই মূল ভবনটি আগে ছিল যাদুঘর। পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে এই মিডল ইংলিশ স্কুলটিকে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করে এর নামকরণ করা হয় Mahima Ranjan Memorial High English School.

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদ্যালয়ের মূল্যবান শিক্ষাপোকরণসহ গুর"ত্বপূর্ণ নথিপত্র লুটপাট ও ধ্বংস হওয়ায় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হলো না। প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকে আপন মহিমায় ভাস্বর। এই বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেছেন এমন অনেক জ্ঞানী গুণী ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে ।

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সর্বজনাব রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, কান্তেশ্বর বর্মন, মোঃ আমীন, মীর আজগর (ড. সাফিয়া খাতুনের বাবা), আলহাজ জছির উদ্দিন আহমেদ, কাজী আসাদুজ্জামান (মন্টু কাজী), ড. যোগেনন্দ্র মোহন রায়, মোঃ সাইয়েদুজ্জামান, ড. মোজাম্মেল হক, প্রকৌশলী আহমেদ আলী, প্রকৌশলী আফতাবুজ্জামান, প্রকৌশলী নূর হোসেন, শওকত আরা শাহীসহ আরো অনেকে।

বিদ্যালয়ের ফলাফল- বিগত তিন বছরের
জমির পরিমাণ : ১২.৪০ একর
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা : ৯২৫ জন।
খেলাধুলা : ১৯৮৩ সালে উপ-অঞ্চল রানার্স আপ।
২০০৪ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন (ফুটবল)
২০০৯ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ন (ফুটবল)।
এ্যাথলেটিকস-এ রাজশাহী অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ।
২০০৯ সালে শীতকালীন জাতীয় এ্যাথলেটিকস:
আয়শা সিদ্দিকা'র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন পদক লাভ।
১০০ মি. দৌড়- স্বর্ণপদক।
২০০ মিঃ দৌড়- রৌপ্য পদক।
লং জাম্প- রৌপ্য পদক এবং
রিলে দৌড়ে- ব্রোঞ্জপদক লাভ।
অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র মো: শফিকুল ইসলাম এক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দ্র"ততম মানব ছিল।

বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র

(আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সে সময় ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির পত্রিকাধ্যক্ষ (সম্পাদক) ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম দিক পাল শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিবন্ধটি লিখেছেন শ্রী প্রিয়রঞ্জন। প্রকাশিত নিবন্ধটি অবিকল মুদ্রিত হলো)

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যখন একটা নতুন সাড়া পড়িল, বাঙ্গালার সেই নবজাগরণের দিনে সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে কত বিচিত্রমুখী হইয়াছিল, তাহা যেমনি বিস্ময়ের ব্যাপার তেমনি কৌতুকাবহ। একদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী তার নব শিক্ষালব্ধ জ্ঞান নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক, অন্যদিকে শুদ্ধ সংস্কৃতনবীশ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শিক্ষিত বাঙালী, পুরাতন সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক–তবু উভয়ের মনই নূতন প্রকার সাহিত্য রচনায় উন্মুখ। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্তটাই প্রায়, বিশেষ করিয়া প্রথমার্ধ, এই দ্বিমুখী চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নতুন রাজধানী কলিকাতা ছিল এই সব নূতন নতূন প্রয়াসের কেন্দ্রস্থ'ল; বহু আলোচনা-সভা ও তর্ক-সমিতির কোলাহলে তখনকার কলিকাতার সমাজ মুখর; নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নিরন্তর নূতন ভাবে, নতুন প্রণালীতে নতুন বিষয় শিক্ষা করিতে ব্যস্ত ; নূতন সমাজের ও সভ্যতার অগ্রদূত যাহারা, তাঁহারাও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষ্যে বা অন্য কারণে কলিকাতাবাসী। আর রাজধানী হইতে দেশের অন্য সর্ব্বত্র এই নতুত প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার কথা। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে সুদূর রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনাতে শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহ কি ভাবে এই নবলব্ধ জ্ঞান ও নবসঞ্চারিত ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।
শম্ভুচন্দ্রের কুলপরিচয় তাঁর সভাসদ কোনও কবির রচনায় দেওয়া আছে।

রমানাথ রায়
রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী
রামনারায়ণ রায় চৌধুরী
রুদ্র রায় চৌধুরী
রসিক রায় চৌধুরী
রামরুদ্র রায় চৌধুরী (ইনি কাকিনায় আনন্দময়ী"
কালীমুর্তির প্রতিষ্ঠা করেন)
রামচন্দ্র কৃষ্ণনাথ ভৈরব চন্দ্র
কালী শম্ভু
কৈলাস মহিমারঞ্জন

শম্ভুচন্দ্র কিছুদিন বারাণসীক্ষেত্রে বাস করেন, সেখানে "আনন্দসভা" স্থাপিত হয়। এই সভার জন্য তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৭ শে ফাল্গুন, শনিবার, মদনপুরা হইতে "আনন্দ সভারঞ্জন চম্পূ প্রথম খন্ড প্রকাশিত করেন। পুস্তকটি কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'আনন্দ' কথাটায় ও ইহার শেষভাগে সন্নিবিশষ্ট 'তত্ত্বসঙ্গীতে' তত্ত্ববোধিনী সভার কিছু প্রভাব আছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নির্ণয় হইবার উপায় নাই। কারণ, পৌরাণিক তত্ত্বের প্রতিও কবির বিলক্ষণ বৈরাগ্য দেখা যায় না। গ্রন্থ'খানি ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রথমে প্রার্থনা, তারপর "জ্ঞান হিতোপদেশ", তারপর শচীন্দ্র কাব্য, তারপর বারাণসীর দেওয়ানী, আগরার তাজমহল, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার, এই সকলের বর্ণনা। তারপর আত্মপ্রসাদ, উর্দ্দু সায়র, সংস্কৃত কাশিকা, তত্ত্বসঙ্গীত। ক্রমে ক্রমে শম্ভুচন্দ্রের রচনারীতি, পান্ডিত্য ও দেশভ্রমণ-প্রীতির কথা বলিতেছি। একে ত চম্পুমাত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নাই, তাহাতে এই চম্পূর রচনা খানিকটা আলোচনা করিলে তাঁহার ভাষা কিরূপ সংস্কৃতের অনুগত ও সেই জন্য কৌতুকাবহ,তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদর্থে 'বিজ্ঞাপনের' (অর্থাৎ ভূমিকার) শেষ বাক্যটা উদ্ধৃত করা গেল–
"এক্ষণে বিদ্যাবিনোদ বন্ধুবৃন্দের বিদিতে প্রার্থনা এই যে জঘন্য জ্ঞানে ঘৃণা না করিয়া গ্রন্থ'খানি পাঠ করতঃ গ্রন্থ'কারের শ্রম সফল করুন এবং ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কোন স্থানে যদি অবিহিত রচনাদি দোষ দৃষ্টি হয় তাহা স্বকৃত দোষের ন্যায় গোপন পূর্বক তৎক্ষণাৎ শোধন করিয়া স্বীয় মহত্ত্বগুণ বিস্তারিত কারুন।"

গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে অনুপ্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা রচনায় শম্ভুচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও রীতি যে কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য প্রথম দুইটা বাক্য উদ্ধৃত করা গেল, রসজ্ঞ পাঠক ইহার সহিত "কাদম্বরী'র তুলনা করিয়া দেখিবেন–

"সভাজনসম্বোধন পুরস্সর কথিত হইতেছে যে পূর্ব্বস্মিন কালে চরাচর প্রবর নিকর অমরনগর সদৃশ ভূমন্ডল স্থিত সর্বজন সন্দোহ স্পৃহণীয় বিশ্রামপুত্র নাম নগরে পরম পবিত্র বিচিত্র চারুমনোহর হর্ম্ম্যবিনির্ম্মিত পুরে অপরিমিত স্পর্দ্ধা প্রবন্ধে চন্ডচন্ডাংশুতুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত সভ্য ভব্য অভিনব্য হব্য কব্য কর্ত্তব্য বিশিষ্ট গরিষ্ঠ শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ মিষ্টভাষি গুণরাশি শিষ্টপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্ট দুষ্টযুষ্টে অনিষ্টকষ্টপ্রকোষ্ঠে প্রবিশষ্টকারিমন্ত্রীচ্ছাচারী স্বকীয়দারী নিত্যবিহারী নবদন্তধারী অমূল্যহারী দ্বাত্রিংশৎসচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ্‌দর্শনামা মহারাজাধিরাজ চক্রচূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার একা মহিষী অতীব প্রেয়সী দীর্ঘকেশী সুচারুবেশী কুরঙ্গনেত্রা সুরঙ্গচেতা ভুজঙ্গহন্তা তুরঙ্গ হাসা বিহঙ্গনাসা মাতঙ্গগামিনী নবাঙ্গভঙ্গিনী শ্রীমতি হিরণ্যগর্ভা সাধ্বী সতী প্রতিপ্রতি রতিমতি বিবিধ ব্রতচারিণী।

শম্ভুচন্দ্রের বাক্যযোজনার সহিত সংস্কৃত ভাষার এতদূর সৌসাদৃশ্য আছে যে, এই প্রসঙ্গে উক্ত জ্ঞানহিতোপদেশ-অধ্যায় হইতে আর দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই বাহুল্যদোষ মার্জনীয়।

"পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে নিতান্ত শাসনের খর্ব্বতা সর্বোতভাবে ঘটিয়াছিল যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে মুলীভূত কারণ পিতামাতার ভদ্রাভদ্র ক্রিয়া প্রতি নিয়োগ বিয়োগ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুযোগ আবশ্যক সুতরাং তাহার বৈপরীত্যে সচ্চরিত্রের পবিত্রতার পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তের স্বাধীনতার বিচিত্র চারুচংক্রমণে সংক্রমের উপক্রমব্যতিক্রমে ক্রমে ক্রমে অসৎক্রমের আক্রমণ সপরাক্রমে স্বভাব সৎক্রম হইতে নিক্রম হইতে লাগিল।"

আবার - "অহমপি উপত্যকা হইতে সভারোহণরূপ উৎসেধ সমাশ্রয়ে উপস্থিতানুসন্ধানে চারুচক্ষুঃ চরণে সংক্রমণ করত সদুল্লাসভাষে প্রকাশ করিতেছি যে ভূপতিরূপ এমন যে রত্নসানু ইহার শোভা দিন দিন পীন হইয়া দীন হীন প্রীণনে চিরদিন প্রবর্ত্তমান থাকুক।"

শম্ভুচন্দ্র পয়ার ছন্দই ভালবাসিতেন, ইহাই তিনি সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থাদৌ প্রার্থনা, তাহার মধ্যে খানিকটা দেহতত্ত্ব, রূপক ও আত্মপরিচয় সংস্কৃত রচনারীতির প্রভাব সূচিত করিতেছে। অধুনা যে আদর্শ নিতান্ত পুরাতন হইয়াছে, তাহা যে তখনকার দিনে মানুষের মনে কিরূপ গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহা প্রথম অংশ পাঠ করিবামাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির আত্মপরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল,-

"জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুর ধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম ॥
তথায় ভূম্যধিকারী রামরুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহা তপস্যায় ॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ভৈরব প্রচার ॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়।
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভূচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক ॥"

পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্যান্য বহুছন্দে রচনা করাও শম্ভুচন্দ্রের অভ্যাস ছিল; "জ্ঞানহিতোপদেশ" অধ্যায়েই আছে। বিভিন্ন ছন্দ অবলম্বনে "রসশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া" গুরু শিষ্যদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন,-

পয়ার ঃ- ব্যসনে মুর্খের কাল অকারণ যায়।
বুদ্ধিমান রসশাস্ত্র আলাপে কাটায় ॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী ঃ- জনকের নিবসতি গিয়া রাম রঘুপতি
হেলায় হরের ধনু বিভঞ্জন করিয়া।
করিলেন উপযম অনুপাম রূপঠাম
জানকী কনকীলতা করে কর ধরিয়া ॥

কুসুম-মালিকা ঃ- কহে রেণুকা তনয় কহে রেণুকা তনয়।
আর বাহুজ বালক মনে বাস নাহি ভয়।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত ঃ- ভ্রূভঙ্গে মহারোষ কোপ প্রকাশা।
শ্রুতিদ্বন্দ্ব নিস্পন্দ ঝঙ্কার নাশা ॥
নবাম্বু প্রবাহে যথা চঞ্চলালি।
তথা লোচনদ্বন্দ্ব লালী বিশালী ॥

এইরূপ ভঙ্গত্রিপদী, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ত-তিলক, তরঙ্গাবলি, ত্রিপদী, ভঙ্গ-পয়ার- নানা ছন্দে শম্ভুচন্দ্র কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়ছেন।

"জ্ঞান হিতোপদেশে'র পর শচীন্দ্রকাব্য। ইহাতে সংস্কৃত রীতির অনুযায়ী আদিরস যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আর ইন্দ্রের পরস্ত্রী-বশ্যতা তো সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির বহুশঃ অনুমোদিত। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তাই ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পরের কয়েকটা রচনায় একটু নূতন সুরের আমেজ আসিয়াছে,- সেগুলি খন্ডশঃ দেব-বর্ণনা। আগ্রা, কাণপুর, কাশী, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার-এই সব স্থানের বর্ণনা। "বারাণসীর দেওয়ালী" -গদ্যে লেখা। আগরার তাজমহল-রৌজা, প্রথমে তাজমহালের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, খাড়াই-চওড়াই ইত্যাদির মাপ। একটা সহজ কৌতুকানন্দ বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে উঁকি মারিতেছে; কিন্তু এই নিতান্ত গদ্যময় বর্ণনার শেষভাগ আবর গম্ভীর ও রূপকাশ্রয়,-

এই সুত্রে বোধ কর অর্ব্বাচীন জন।
শরীরে চৈতন্য বস্তু আছেন তেমন ॥
আনন্দ সভার জয় আনন্দ কৃপায়।
আনন্দ কোষের বস্তু আনন্দ দেখায় ॥
আনন্দ সভার ভৃত্য নিত্যানন্দে মজি।
আনন্দেশ্বরেতে মত্ত তেজ তত্ত্ব ভজি ॥
ইতি তাজমহল রৌজাদর্শনানন্দরস পরিপাক সমাপ্তশ্চেতি।

ষোল অক্ষরের পয়ার আবার -একটু নূতন রকমের ছন্দ, কিন্তু ছন্দ মাত্রই, রস কিছুমাত্র নাই। যথা-

আসার নিবৃত্তি নাই, চক্ষুরাদি কাহারোই।
বারেক দেখিলে শান্ত তৃষ্ণা পুন তাহারই ॥
এ যাত্রা বাসনা খর্ব্ব সুতরাং গেল করা।
ধন্যবাদ দেই সেই যার সৃষ্টি হাতে ধরা ॥

চম্পূখানিতে ইহা ছাড়া দুই পাঠ আত্মপ্রসাদ, দুই পাঠ উর্দ্দূ সায়র, দুই পাঠ সংস্কৃত কাশিকা আছে। তখনকার দিনে উর্দ্দূ বা ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-তিনটি ভাষায় তিন ধারা যে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মধ্যে খেলা করিত ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইত, তাহার বিচিত্র নিদর্শন শম্ভুচন্দ্রের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন, তাঁহার উর্দ্দূ ছন্দ অবলম্বনে বাঙ্গালা কবিতা। ছন্দ,-

ও জন জলেখা
ফায়লাতুন ফায়লাতুন ফায়লা
মফউলন্ মফউলন্ মফউলন্
"বিমোহে ভুলিয়া ভূমা তোমারে।
ক্ষমস্ব সে গুণাদোষং আমারে।।"

কাশিকাদ্বয় হইতে বসন্ত ও শরৎকালের বর্ণনা পাই, শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে দুইটা শ্লোক বাছিয়া পাঠকসমাজে উপহার দেই,-

বসন্তে - তুরগরথনিষন্না ফ্রীঙ্গবালা সুচেলা
চিকুররচনশিল্পে স্তত্র নানাত্ববেণী।
মৃদুমৃদুবদযুক্তা দক্ষিণস্থং স্বকান্তং
ঋতুপশুভহসন্তে কাশিকা কং ন মোহা ॥

শরৎকালে- জবাবন্তী জাতী টগ্‌র করবীরারনি মণিঃ
সমুৎফুল্লুৎফুল্লুং চরণগতচেতাজনগণং।
পথে রথ্যা ঘোরা কিল জবনবার্ত্তামুপদিশন্

নভদ্বারে দ্বারে সরদি শুভকাশী বিলসতি ॥

শেষের পংক্তি প্রতিবার বহুলীকৃত হইয়াছে, ইংরাজী refrain- এর মত।

শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপয় সহসা একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ভার দিলে ও দেশে বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর চর্চ্চা না থাকিলে যেরূপ রচনা আশা করিতে পারা যায়, আধুনিক সমালোচক শম্ভুচন্দ্রের রচনায় সেইরূপ দোষগুণ অল্পবিস্তার দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতই হইবে যে, ধ্বনির প্রভাব অতীতে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই; অথবা আমাদের জীবনে ছন্দের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে, কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনাও নীরস হইয়া পড়িতেছে।

একমাত্র রসসৃষ্টিই শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মনে দেশের নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তনের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, এবং দেশের শিল্পোন্নতি কি ভাবে হইতে পারে, ধর্ম্মবিষয়ে একটা জীবন্ত আগ্রহের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে, বাঙ্গালা অক্ষরে সকল ধ্বনির প্রতিরূপ কি উপায়ে পাওয়া যায়,- এইরূপ বহুবিষয়ে তিনি মন দিয়াছিলেন। শ্রম
(আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সে সময় ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির পত্রিকাধ্যক্ষ (সম্পাদক) ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম দিক পাল শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিবন্ধটি লিখেছেন শ্রী প্রিয়রঞ্জন। প্রকাশিত নিবন্ধটি অবিকল মুদ্রিত হলো)

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যখন একটা নতুন সাড়া পড়িল, বাঙ্গালার সেই নবজাগরণের দিনে সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে কত বিচিত্রমুখী হইয়াছিল, তাহা যেমনি বিস্ময়ের ব্যাপার তেমনি কৌতুকাবহ। একদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী তার নব শিক্ষালব্ধ জ্ঞান নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক, অন্যদিকে শুদ্ধ সংস্কৃতনবীশ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শিক্ষিত বাঙালী, পুরাতন সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক–তবু উভয়ের মনই নূতন প্রকার সাহিত্য রচনায় উন্মুখ। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্তটাই প্রায়, বিশেষ করিয়া প্রথমার্ধ, এই দ্বিমুখী চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নতুন রাজধানী কলিকাতা ছিল এই সব নূতন নতূন প্রয়াসের কেন্দ্রস্থ'ল; বহু আলোচনা-সভা ও তর্ক-সমিতির কোলাহলে তখনকার কলিকাতার সমাজ মুখর; নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নিরন্তর নূতন ভাবে, নতুন প্রণালীতে নতুন বিষয় শিক্ষা করিতে ব্যস্ত ; নূতন সমাজের ও সভ্যতার অগ্রদূত যাহারা, তাঁহারাও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষ্যে বা অন্য কারণে কলিকাতাবাসী। আর রাজধানী হইতে দেশের অন্য সর্ব্বত্র এই নতুত প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার কথা। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে সুদূর রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনাতে শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহ কি ভাবে এই নবলব্ধ জ্ঞান ও নবসঞ্চারিত ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।
শম্ভুচন্দ্রের কুলপরিচয় তাঁর সভাসদ কোনও কবির রচনায় দেওয়া আছে।

রমানাথ রায়
রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী
রামনারায়ণ রায় চৌধুরী
রুদ্র রায় চৌধুরী
রসিক রায় চৌধুরী
রামরুদ্র রায় চৌধুরী (ইনি কাকিনায় আনন্দময়ী"
কালীমুর্তির প্রতিষ্ঠা করেন)
রামচন্দ্র কৃষ্ণনাথ ভৈরব চন্দ্র
কালী শম্ভু
কৈলাস মহিমারঞ্জন

শম্ভুচন্দ্র কিছুদিন বারাণসীক্ষেত্রে বাস করেন, সেখানে "আনন্দসভা" স্থাপিত হয়। এই সভার জন্য তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৭ শে ফাল্গুন, শনিবার, মদনপুরা হইতে "আনন্দ সভারঞ্জন চম্পূ প্রথম খন্ড প্রকাশিত করেন। পুস্তকটি কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'আনন্দ' কথাটায় ও ইহার শেষভাগে সন্নিবিশষ্ট 'তত্ত্বসঙ্গীতে' তত্ত্ববোধিনী সভার কিছু প্রভাব আছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নির্ণয় হইবার উপায় নাই। কারণ, পৌরাণিক তত্ত্বের প্রতিও কবির বিলক্ষণ বৈরাগ্য দেখা যায় না। গ্রন্থ'খানি ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রথমে প্রার্থনা, তারপর "জ্ঞান হিতোপদেশ", তারপর শচীন্দ্র কাব্য, তারপর বারাণসীর দেওয়ানী, আগরার তাজমহল, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার, এই সকলের বর্ণনা। তারপর

আত্মপ্রসাদ, উর্দ্দু সায়র, সংস্কৃত কাশিকা, তত্ত্বসঙ্গীত। ক্রমে ক্রমে শম্ভুচন্দ্রের রচনারীতি, পান্ডিত্য ও দেশভ্রমণ-প্রীতির কথা বলিতেছি। একে ত চম্পুমাত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নাই, তাহাতে এই চম্পূর রচনা খানিকটা আলোচনা করিলে তাঁহার ভাষা কিরূপ সংস্কৃতের অনুগত ও সেই জন্য কৌতুকাবহ,তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদর্থে 'বিজ্ঞাপনের' (অর্থাৎ ভূমিকার) শেষ বাক্যটা উদ্ধৃত করা গেল–

"এক্ষণে বিদ্যাবিনোদ বন্ধুব্যুহের বিদিতে প্রার্থনা এই যে জঘন্য জ্ঞানে ঘৃণা না করিয়া গ্রন্থ'খানি পাঠ করতঃ গ্রন্থ'কারের শ্রম সফল করুন এবং ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কোন স্থানে যদি অবিহিত রচনাদি দোষ দৃষ্টি হয় তাহা স্বকৃত দোষের ন্যায় গোপন পূর্বক তৎক্ষণাৎ শোধন করিয়া স্বীয় মহত্ত্বগুণ বিস্তারিত কারুন।"

গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে অনুপ্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা রচনায় শম্ভুচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও রীতি যে কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য প্রথম দুইটা বাক্য উদ্ধৃত করা গেল, রসজ্ঞ পাঠক ইহার সহিত "কাদম্বরী'র তুলনা করিয়া দেখিবেন–

"সভাজনসম্বোধন পুরস্সর কথিত হইতেছে যে পূর্ব্বস্মিন কালে চরাচর প্রবর নিকর অমরনগর সদৃশ ভূমন্ডল স্থিত সর্বজন সন্দোহ স্পৃহণীয় বিশ্রামপুত্র নাম নগরে পরম পবিত্র বিচিত্র চারুমনোহর হর্ম্ম্যবিনির্ম্মিত পুরে অপরিমিত স্পর্দ্ধা প্রবন্ধে চন্ডচন্ডাংশুতুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত সভ্য ভব্য অভিনব্য হব্য কব্য কর্ত্তব্য বিশিষ্ট গরিষ্ঠ শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ মিষ্টভাষি গুণরাশি শিষ্টপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্ট দুষ্টযুষ্টে অনিষ্টকষ্টপ্রকোষ্ঠে প্রবিশষ্টকারিমন্ত্রীচ্ছাচারী স্বকীয়দারী নিত্যবিহারী নবদন্তধারী অমূল্যহারী দ্বাত্রিংশৎসচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ্‌দর্শনামা মহারাজাধিরাজ চক্রচূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার একা মহিষী অতীব প্রেয়সী দীর্ঘকেশী সুচারুবেশী কুরঙ্গনেত্রা সুরঙ্গচেতা ভুজঙ্গহন্তা তুরঙ্গ হাসা বিহঙ্গনাসা মাতঙ্গগামিনী নবাঙ্গভঙ্গিনী শ্রীমতি হিরণ্যগর্ভা সাধ্বী সতী প্রতিপ্রতি রতিমতি বিবিধ ব্রতচারিণী।

শম্ভুচন্দ্রের বাক্যযোজনার সহিত সংস্কৃত ভাষার এতদূর সৌসাদৃশ্য আছে যে, এই প্রসঙ্গে উক্ত জ্ঞানহিতোপদেশ-অধ্যায় হইতে আর দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই বাহুল্যদোষ মার্জনীয়।

"পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে নিতান্ত শাসনের খর্ব্বতা সর্বোতভাবে ঘটিয়াছিল যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে মুলীভূত কারণ পিতামাতার ভদ্রাভদ্র ক্রিয়া প্রতি নিয়োগ বিয়োগ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুযোগ আবশ্যক সুতরাং তাহার বৈপরীত্যে সচ্চরিত্রের পবিত্রতার পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তের স্বাধীনতার বিচিত্র চারুচংক্রমণে সংক্রমের উপক্রমব্যতিক্রমে ক্রমে ক্রমে অসৎক্রমের আক্রমণ সপরাক্রমে স্বভাব সৎক্রম হইতে নিষ্ক্রম হইতে লাগিল।"

আবার - "অহমপি উপত্যকা হইতে সভারোহণরূপ উৎসেধ সমাশ্রয়ে উপস্থিতানুসন্ধানে চারুচক্ষুঃ চরণে সংক্রমণ করত সদুল্লাসভাষে প্রকাশ করিতেছি যে ভূপতিরূপ এমন যে রত্নসানু ইহার শোভা দিন দিন পীন হইয়া দীন হীন প্রীণনে চিরদিন প্রবর্ত্তমান থাকুক।"

শম্ভুচন্দ্র পয়ার ছন্দই ভালবাসিতেন, ইহাই তিনি সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থাদৌ প্রার্থনা, তাহার মধ্যে খানিকটা দেহতত্ত্ব, রূপক ও আত্মপরিচয় সংস্কৃত রচনারীতির প্রভাব সূচিত করিতেছে। অধুনা যে আদর্শ নিতান্ত পুরাতন হইয়াছে, তাহা যে তখনকার দিনে মানুষের মনে কিরূপ গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহা প্রথম অংশ পাঠ করিবামাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির আত্মপরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল,-

"জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুর ধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম ॥
তথায় ভূম্যধিকারী রামরুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহা তপস্যায় ॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ভৈরব প্রচার ॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়।
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভূচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক ॥"

পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্যান্য বহুছন্দে রচনা করাও শম্ভুচন্দ্রের অভ্যাস ছিল; "জ্ঞানহিতোপদেশ" অধ্যায়েই আছে। বিভিন্ন ছন্দ অবলম্বনে "রসশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া" গুরু শিষ্যদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন,-

পয়ার ঃ- ব্যসনে মুর্খের কাল অকারণ যায়।
বুদ্ধিমান রসশাস্ত্র আলাপে কাটায় ॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী ঃ- জনকের নিবসতি গিয়া রাম রঘুপতি
হেলায় হরের ধনু বিভঞ্জন করিয়া।
করিলেন উপযম অনুপাম রূপঠাম
জানকী কনকীলতা করে কর ধরিয়া ॥

কুসুম-মালিকা ঃ- কহে রেণুকা তনয় কহে রেণুকা তনয়।
আর বাহুজ বালক মনে বাস নাহি ভয়।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত ঃ- ভ্রূভঙ্গে মহারোষ কোপ প্রকাশা।
শ্রুতিদ্বন্দ্ব নিস্পন্দ ঝঙ্কার নাশা ॥
নবাম্বু প্রবাহে যথা চঞ্চলালি।
তথা লোচনদ্বন্দ্ব লালী বিশালী ॥

এইরূপ ভঙ্গত্রিপদী, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ত-তিলক, তরঙ্গাবলি, ত্রিপদী, ভঙ্গ-পয়ার- নানা ছন্দে শম্ভুচন্দ্র কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়ছেন।

"জ্ঞান হিতোপদেশে'র পর শচীন্দ্রকাব্য। ইহাতে সংস্কৃত রীতির অনুযায়ী আদিরস যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আর ইন্দ্রের পরস্ত্রী-বশ্যতা তো সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির বহুশঃ অনুমোদিত। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তাই ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পরের কয়েকটা রচনায় একটু নূতন সুরের আমেজ আসিয়াছে,- সেগুলি খন্ডশঃ দেব-বর্ণনা। আগ্রা, কাণপুর, কাশী, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার-এই সব স্থানের বর্ণনা। "বারাণসীর দেওয়ালী" -গদ্যে লেখা। আগরার তাজমহল-রৌজা, প্রথমে তাজমহালের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, খাড়াই-চওড়াই ইত্যাদির মাপ। একটা সহজ কৌতুকানন্দ বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে উঁকি মারিতেছে; কিন্তু এই নিতান্ত গদ্যময় বর্ণনার শেষভাগ আবর গম্ভীর ও রূপকাশ্রয়,-

এই সুত্রে বোধ কর অর্ব্বাচীন জন।
শরীরে চৈতন্য বস্তু আছেন তেমন ॥
আনন্দ সভার জয় আনন্দ কৃপায়।
আনন্দ কোষের বস্তু আনন্দ দেখায় ॥
আনন্দ সভার ভৃত্য নিত্যানন্দে মজি।
আনন্দেশ্বরেতে মত্ত তেজ তত্ত্ব ভজি ॥
ইতি তাজমহল রৌজাদর্শনানন্দরস পরিপাক সমাপ্তশ্চেতি।

ষোল অক্ষরের পয়ার আবার -একটু নূতন রকমের ছন্দ, কিন্তু ছন্দ মাত্রই, রস কিছুমাত্র নাই। যথা-

আসার নিবৃত্তি নাই, চক্ষুরাদি কাহারোই।
বারেক দেখিলে শান্ত তৃষ্ণা পুন তাহারই ॥
এ যাত্রা বাসনা খর্ব্ব সুতরাং গেল করা।
ধন্যবাদ দেই সেই যার সৃষ্টি হাতে ধরা ॥

চম্পূখানিতে ইহা ছাড়া দুই পাঠ আত্মপ্রসাদ, দুই পাঠ উর্দ্দূ সায়র, দুই পাঠ সংস্কৃত কাশিকা আছে। তখনকার দিনে উর্দ্দূ বা ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-তিনটি ভাষায় তিন ধারা যে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মধ্যে খেলা করিত ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইত, তাহার বিচিত্র নিদর্শন শম্ভুচন্দ্রের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন, তাঁহার উর্দ্দূ ছন্দ অবলম্বনে বাঙ্গালা কবিতা। ছন্দ,-

ও জন জলেখা

ফায়লাতুন ফায়লাতুন ফায়লা
মফউলন্ মফউলন্ মফউলন্
"বিমোহে ভুলিয়া ভূমা তোমারে।
ক্ষমস্ব সে গুণাদোষং আমারে।।"

কাশিকাদ্বয় হইতে বসন্ত ও শরৎকালের বর্ণনা পাই, শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে দুইটা শ্লোক বাছিয়া পাঠকসমাজে উপহার দেই,-

বসন্তে - তুরগরথনিষন্না ফ্রীঙ্গবালা সুচেলা
চিকুররচনশিল্পে স্তত্র নানাত্ববেণী।
মৃদুমৃদুবদযুক্তা দক্ষিণস্থং স্বকান্তং
ঋতুপশুভহসন্তে কাশিকা কং ন মোহা ॥

শরৎকালে- জবাবন্তী জাতী টগ্‌র করবীরারনি মণিঃ
সমুৎফুল্লুৎফুল্লুং চরণগতচেতাজনগণং।
পথে রথ্যা ঘোরা কিল জবনবার্ত্তামুপদিশন্
নভদ্বারে দ্বারে সরদি শুভকাশী বিলসতি ॥

শেষের পংক্তি প্রতিবার বহুলীকৃত হইয়াছে, ইংরাজী refrain- এর মত।

শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপয় সহসা একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ভার দিলে ও দেশে বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর চর্চ্চা না থাকিলে যেরূপ রচনা আশা করিতে পারা যায়, আধুনিক সমালোচক শম্ভুচন্দ্রের রচনায় সেইরূপ দোষগুণ অল্পবিস্তার দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতই হইবে যে, ধ্বনির প্রভাব অতীতে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই; অথবা আমাদের জীবনে ছন্দের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে, কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনাও নীরস হইয়া পড়িতেছে।

একমাত্র রসসৃষ্টিই শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মনে দেশের নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তনের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, এবং দেশের শি শিল্পের উন্নতির প্রতি তাঁহার যে সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল, "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ"-তে রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভার প্রতি তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। স্ব-রচিত দশটা গান গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে, সবগুলি তত্ত্বমুলক, রসবেগে চঞ্চল নয়, সুতরাং তাহাদের আলোচনায় আমদের উপকার নাই। শেষের গানটা তবু সহজ,

বড় আনন্দের বিষয়।
এ আনন্দ কাননে উদয়।।
আনন্দ কানন একে সদা সদানন্দ ঠেকে
তায় আনন্দ সভা দেখে কে আনন্দ নয় ॥
যত সভ্য সভাপতি সর্ব্বদা নির্ম্মলমতি
ব্রাহ্মণ পন্ডিত যতি সঙ্গে সদা রয় ॥

শম্ভুচন্দ্রের ভাষাসংস্কারের চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কার্য্যানুরোধে বহু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার বাহিরে থাকিতে হয়, ফারসি ও উর্দ্দূ শিখিতেও হয়, কিন্তু ফারসি হরপে লেখা উর্দ্দূ জোবান অভ্যস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। "পাসসি আরবি শব্দে যে যে স্থানে জ্জিম খে শে্ জ আয়েন গায়েন ফে কাপ- এহি সপ্তাক্ষর তাদৃশ কখনই হয় না, বরং অশুদ্ধ উচ্চারণে উর্দ্দূ অভ্যাস করিয়া আলাপ করিতে গেলে, বিদ্রূপ ব্যঙ্গই লাভ হয়।" সুতরাং আকবর বাদসাহের সময় যে ভাবে সংস্কার হইয়াছিল, সেইভাবে কাজ করা উচিত। শম্ভুচন্দ্রের ভাষায়ই তাঁহার বক্তব্য বলি।-

"পারসীতে বাঙ্গলা বর্ণ বর্গের প্রায়শ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অন্যান্য বর্ণই অভাব অর্থাৎ প্রথমত ট প চ ড ড় দ্বিতীয়তঃ ভ থ ফ ঠ ঝ ছ ধ ঢ ঢ় খ ঘ সমুদয়ে ষোড়শ বর্ণই ছিল না, তখন কতিপয় পারসীক বিদ্বান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া উক্ত কয়েক অক্ষর আপনাদিগের পারসী অক্ষরে গঠিয়া লইলেন প্রথমতঃ তের উপর চারি নোক্তাতে ট ও বের নীচে তিন নোক্তাতে প ও জ্জিমের নীচে তিন নোক্তাতে চ এবং দালের উপর চার নোক্তাতে ড ও বের উপরে তো অক্ষরে ড় দ্বিতীয়তঃ বে হে ভ। তে হে থ। পে হে ফ। টে হে ঠ। জ্জিম হে ঝ। চে হে ছ। দাল হে ধ। ডাল হে ঢ। ড়ে হে ঢ়। কাফ হে খ। গাফ হে ঘ ইত্যাদি। পারসীক বিদ্বানেরা যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দেশী ঠে ট প্রভৃতি লিখার সুবিধা করিয়া লাইলেন কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পারসী ও আরবী শব্দসকল শুদ্ধরূপ লিখাপড়া করার নিমিত্ত বাঙ্গলা অক্ষরের রূপান্তর অথবা কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া উচ্চরণের কিছুই সুবিধা করিলেন না। সুতরাং উক্ত অক্ষরে বঙ্গীয় সাধুভাষা ভিন্ন অন্যভাষা শুদ্ধরূপ লিখনের রীতি ও ব্যবহারও নাই শ্বেতকান্তি পুরুষেরা যাহারা সমুদয় বিদ্যাতেই দৃষ্টি সমান রাখেন তাহারাও এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্যার সহিত পারসী, আরবী বিদ্যার বিশেষরূপ সমন্বয় বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন; কিন্তু স্বজাতীয় ইংলিশ অক্ষরের দ্বারা উর্দ্দূ ও

বাঙ্গলা শুদ্ধরূপ লিখার অক্ষর গঠনের বিধিস্বরূপ রোমেন ক্যারেক্ট নামে বিলক্ষণ এক বিদ্যা সৃষ্টি করিয়ছেন এবং তদ্বারা অনেক ইংলিশমাত্রবেত্তার যথেষ্ট উপকার দর্শিতেছে এ অবস্থায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে পারসী আরবী অক্ষরের সহিত বাঙ্গলা অক্ষরকে কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ঐক্য করতঃ বাঙ্গলা অক্ষরে উর্দ্দূ পারসী লিখার কোন এক সঙ্কেত যদি করা যায় তাহা হইলে সাধারণের উপকার হইতে পারে কি না।"

শম্ভুচন্দ্রের "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ" হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তদনীন্তন বিদ্যনুরাগীর মনের উপর পাশ্চত্ত্য সাহিত্য ও সমাজের আদর্শ কি ভাবে কাজ করিয়াছিল; সাহিত্যের পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন রচনানীতির আকর্ষণ তখনও বেশ প্রবল ছিল, আর অন্যদিকে নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করার লোভও দুর্নিবার। তাই একদিকে যেমন চম্পূ লেখা হইত এবং সে চম্পূতে বিষ্ণুশর্ম্মা-হিতোপদেশের প্রতিচ্ছায়া পড়িত, অন্যদিকে আবার তেমনই স্থানবিশেষের বর্ণনা, নুতন করিয়া অক্ষর গড়িয়া ভাষার পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয় দেখা যাইতেছে;- জ্ঞানের স্বল্পতা তাঁহার পিড়া দিত না, তাঁহাকে সহিত্য রচনা হইতে বিরত করিত না।

শম্ভুচন্দ্র-সম্পর্কিত আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহার সভায় কোনও এক পন্ডিত পারস্য উপন্যাস সংস্কৃতে অনুবাদ করেন, এই অনুদিত কাব্যের নাম "ফখলাজাখ্যং কাব্যম"- এই অভিনব গন্থের সামান্য পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। ফখলাজ-কাব্যের প্রথম খন্ড (অন্যান্য খন্ডে আমি দেখি নাই) পঁচিশ অধ্যায় সম্পূর্ণ; গ্রন্থরচনার ইতিহাস গ্রন্থশেষে বিজ্ঞাপন-ভাগে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বিবিধসদগুণ নিকেতন কাকিনীয়াধিপতি শম্ভুচন্দ্ররায় চতুর্ধূরীয়ঃ স্বয়মেকদা স্বসমজ্যায়াং মামাহূয় সংস্কৃতগদ্যপদ্যৈঃ পারস্যোপন্যাসং রচয়িতুমদিশৎ প্রযত্নেন। তন্নিদেশস্যালঙ্ঘ্যতয়া স্বস্মিন্ কবিত্ববিত্তাদ্যসদ্ভাবেহপি নির্ল্লজ্জতামঙ্গীকৃত্য যথাশক্তি বর্ণ্ণনং করবাণীতি প্রতিজ্ঞায় মদীয় সস্নেহ-সম্মানাস্পদ শ্রীমদ্‌গোবিন্দমোহন রায় সদাশয়েনাধ্যবসায়িতঃ এতস্মিন প্রবন্ধরচনাকর্ম্মণ্যহং প্রবর্ত্তিতঃ। কতিপয়বাসরানন্তরম প্রোক্তসোৎসাহনিদেশকর্ত্তু জীবিতকালেন সমমেব গ্রন্থরচনাহপ্যবসিতাভূৎ। সম্প্রতি তত্তনয়-সদ্বিদ্যানুরাগি-সদাশয়-শ্রীমন্মহিমারঞ্জনরায়েণ প্রযত্নতো মুদ্রণং কারয়িত্বৈতৎ পুস্তকম্প্রকটীকৃতম্। অস্মিন্ ভ্রমপ্রমাদিভি র্বহবো দোষা সংজাতা এব। তাদাদ্যন্তং কৃপয়া সংশোধ্য গুণিগণাঃ পঠন্ত্বিত্যে বার্থয়েহহং। "গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে" অলমতি বিস্তরেণ। রচয়িতা

শাকে চন্দ্রনবাজীন্দু প্রমিতে কাকিনাপুরে।
কেনচিন্মুদ্রিঞ্চৈতৎ তঞ্চৈতৎ পুস্তকং শম্ভুচন্দ্রতঃ ॥

পারস্য রাজকন্যার নামে গন্থের নাম। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পর কাকিনীয়াধিপতির বংশাবলী ও সভার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। শম্ভুচন্দ্র যে একটা পন্ডিত সভা গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন, স্মৃত্যাদিশাস্ত্রবিৎ গুরুদাস শিরোমণি, জ্যোতির্ব্যাকরণাদি বিবিধশাস্ত্রপ্রবীণ কালীচন্দ্র চুড়ামণি, কাব্যব্যাকরণবিচক্ষণ বিশ্বেন্দ্রন্যায়রত্ন, বিবিধশাস্ত্রদর্শী শ্রীকান্ত বাচস্পতি, কাব্যাদিবিশারদ শ্রীশ্বর বিদ্যাভূষণ- ইহারা ছিলেন তাঁর সভাপন্ডিত। সকলদর্শী লেখক, অমাত্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সেখ মছরফ প্রমুখ সর্দ্দার, শ্রীমোছাবুদ্দিন জেলদকার ও সেখ বাহালি জমাদার পর্য্যন্ত সকলেরই নাম করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দবাগ, মোনবাগ, সুললিতবাগ, আনন্দবাগ, কালীবাগ, লোচনাবাগ, বর্দ্ধবাগ, বেগমবাগ, সুমানেবাগ, কাঞ্চনবাগ-ইত্যাদি উপবন ও তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে যে সভার উৎসাহে ও অনুমোদনে পারস্য-উপন্যাস পর্য্যন্ত সংস্কৃতে অনুদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আশা করি, বলিবার আর কিছু নাই, উপাখ্যানভাগ তো সকলেরই জ্ঞাতপূর্ব্ব। শুধু কাব্যের পাদটীকায় রচয়িতার লেখা কয়েকটি ব্যুৎপত্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে চাই।

(১) হারুনল রসীদ ইতি। দময়ন্তীবিচ্ছেদজনিতবিষাদেন হা ইতি রৌতি শব্দং করোতীতি হারুঃ। হারুশ্চাসৌ নলশ্চেতি হারুনলঃ হারুনলস্য রসো গুণোস্যাস্তীতি হারুনলরসী ঈদঃ শ্রীদঃ ইতি হারুনলরসীদঃ

(২) বাগদাদ ইতি। বস্য বলবজ্জনস্য বগদাং দদাতীতি বগদদ: ॥ ব: বলবান ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী ॥

(৩) জাফর ইতি। জেন জেত্রা জয়কর্ত্রা অফরঃ ন ফরং যস্য স জাফরঃ। জঃ জেতা ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী। ফরং ফলং ইতি তদ্ধৃতামরটীকায়াং ভরতঃ ॥

(৪) দামাশ নগর ইতি দামনি আশা যস্য স দামাশো নগরঃ ॥

(৫) আবাল কসম ইতি উদারতাদিভি রাবালস্য সমঃ তুল্যঃ ইতি আবালকসমঃ।। শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে জগদ্বন্ধু নামে জনৈক লেখক আরব্য-রজনী "আরব্য যামিনী" নাম দিয়া সংস্কৃত ভাযায় অনুবাদ করেন; ১২৯৯ বঙ্গাব্দের লিখিত ইহার এক পুথি

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপরোদ্ধৃত শব্দব্যুৎপত্তি হইতে তখনকার সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। শম্ভুচন্দ্র নিজের চারিদিকে একটা সাহিত্যের, শিক্ষক, বিদ্যার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের আয়োজন সুবিদিত ছিল; দুঃখের কথা, আজকাল তাহা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে যাই, তখন শুনিলাম, তাঁহার গ্রন্থগৃহ সর্পবহুল এবং দিবালোকে দীপ জালিয়া সাত আটজন লোক লইয়া অতি সতর্কতার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে-নতুবা বিপদের সম্ভাবনা আছে। মনে করি, তাঁহার সেই অযত্ন রক্ষিত পুস্তক-সংগ্রহ দেখিয়া লাভবান হইয়াছি। তখনকার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ও পুথি হেলায় পড়িয় আছে,- যাঁহাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহারা অর্থের অনটনেই হউক আর অন্য যে কারণেই হউক, এবিষয়ে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তথাপি বিচিত্র বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে ও নবোদ্বুদ্ধ বঙ্গ সাহিত্যের আত্মপ্রকাশচেষ্টায় সমাজে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, শম্ভুচন্দ্রের নিজের ও সভাসদের রচনার মধ্যে সে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন আছে মনে করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯ ফাল্গুন, ১৩৩৭

FROM THE SCENES OF THE LOST PARADISE

Jogendra Mohan Ray

Where is paradise. where is hell?
Who says afar they are?
In man paradise, in man hell
On this earth they are."
(Translated from Bengali)

These were the famous verse of the poet sheikh Fazlul Karim of Kakina. In the old days Kakina had everyhing one could wish for living in a village.

When I was twelve I came to live at Kakina in order to study at the English High School after finishing what was known in those days as the English middle school, . what was known in those days as the English Middle School in a nearby village of bhotemari, where my falher late…..was the honorary Headmastel. Coming to study at Kakina was very much a sentimental journey, for my father studied there too.
The school was unique in that it lent itself to learning. It was well known for good teaching . The teachers were highly qualified and dedicated. They often went out ot their way to help pupils in their understanding of lessons.

The huge foreground was for physical training and mass drill on Friday afternoons. There was an octagonal mound in the centre beside a couple of conifers. The mound formed the centre piece for ceremonial ocasions and other special events, like projection of documentary films by toming comparnies using their own portable equipment. We played volleyball on one side of the mound in the winter. When the summer vacation approached we would organise ourselves to pick mangoes, lychees and distribute them amongst all pupils.
To the east and the west, there were two big ponds. They had lotus and other water plants wlich overwhelmingly formed the subject of our botanical studies as well as the chestnut, rubber and othe tropical plants to the north of the school building. Our science teacher made references to these plants when telling us about the plant life. There were two or three rare specimens of flowering trees to the west courtyard collected from the north west of India. The fish in the ponds were left alone.

In the far corner to the north- west there were two football grounds (one for the junior- B team and the other for the senior-A team) where we held tournaments which the neighbouring schools and clubs prticipated in. The school had a good name for football.

To the north of the senior football ground there was a mashjid where on Fridays (in the midday recess period) the Muslim pupils would be lead by theMuslim teachers for

prayers meanwhile the Hindn pupils would go to the temple beside stables on the south bank of the pond, to the west accompanied by the Sanskrit teacher, where they would worship by chanting Sanskrit verses

On either corner in the front of the building there were flowering trees, called Bakul. We collected the cream coloured little flowers, enjoying their mild scent and their little fruit. On a very cold day in the winter we had our classes under these trees, taking pleasure in the sun at the same time.

We were part of the nature that surounded us, which in turn complemented our classroom education. It had boldness in its form and colour and gentleness in its ambieuce that inspired our English teacher to explain the `law and impulse' of Wordsworth.

He was a nice person; in the winter if it rained he always appeared through the avenue of bare gulmohur trees that lined the road to the palace in a Macintosh and a woollen scarf which covered his head and neck, and holding books against his chest. These trees would give a spectacular display of colours in the summer.
It was education in both the academic and natural world which maintained a good balance when growing up . It helped us see the beauty and wonder of the rainbow, and heaven in a wild flower, just as much as poetry could make up about them. Everybody soon became so well known to everybody else that intimacy quickly grew, and teachers felt responsible for the well-being of every pupil, they were for us, guardians caring for the development of human faculties in everyone, in an atmosphers which everybody crented. A teacher would not hesitate to go to a pupil's home in order to advise him or her on how to improve results, and moreover offer reference materials to read. Likewise a pupil could see a teacher any time whether at school or at home. I remember, together with a friend of mine I saw our Sanskrit teacher on two occasions about Sanskrit grammar very late at night before our final examination.

We held a reunion of past and present pupils every summer. This was a great occasion on which we would celebrate for three days. During this reunion all classes would be suspended and everybody had some duty to perform. The main feature of this celebration was that everything was done by the pupils, no teacher was involved. All glass cases of the original museum items would be put on one side near the girls common room, beside the library, and other side a platform would be prepard for the theater. Two of the classrooms would be arranged for an exhibition of the work, all done by the pupils. This included paintings, crafts, some innovative gadgets and embroidery which attracted a large crowd of ladies, for whom the exhibtion was something to look forward to. There would be theatre performances, one night by the boys and the next night by the girls, and on the final night songs, recitations, talks and presentations of essays written by the pupils, on how they saw the reunion, followed by the prize giving ceremony presided over by some well-knoen person. Local people from the surrounding area came and went all day as we used to have sports., mass drill, display of martial art and Boy Scouts exercises including flag signallaing on the foreground of the school building. A swimming competition in Shambhu Sagar, the big pond in the village, was also included

in the progrmme. In some years it would be possible to organise a game of football of present versus past pupils.
There were two religious festivals in the school. One was Saraswati Puja by the Hindus and the other Milad Sharif by the Muslims. Money was raised by collecrion for these festivals. While the Saraswati Puja was wholly managed by the pupils and for the pupils, Milad Sharif was different. Although it was arranged by the pupils for the pupils in partial fulfilment of religious education, it served a greater purpose for the people of Kakina as well as the pupils within the school. These two festivals became a tradition in the school calendar.

Brahmo is a group of people who worship the Almighty One. There was a temple in Kakina for this group on the north bank of Shambhu Sagar . Between the south bank of shambhu sagar and the river Tista was the Hindu temple of Kali.

Every year in February someone renowned came to conduct the annual prayer festival in the Brabmo temple, we called it Samaj Kstimohan Sen of Shanti Niketan came two or three times. A few of us were privileged to meet him in his lodging and have the opportunity to listen to his views on religion. Afterwards we would walk along the river bank and watch the setting sun on the horizon. During these festivals we would write and read essays on religion and sing devotional songs.
Surroundong the Samaj was a beauliful garden of colourful flowers, mango, dates, palm and jack fruit trees. There was also an artificial river beside a manmade hill further upstream within a large area of raintrees. Rumour has it that the Raja walked up to the top of the hill to enjoy the panoramic views across the river Tista to the south.

Now and again elders organised welfare programmes for general awareness of the people of Kakina. The subjects were on how to grow more food, the need to weed out the wild hyacinth in ponds, fill up stagnant water on low lands to combat malaria and encourage small pox vaccination and measures against water-borne diseases. The elders came to help people in need. They helped to re-habilitate one man, who for some reason was under great psychological pressure and lived ouldoors in all weather conditions.

When the ten year old son of the clerk at the Tax Collector's Office had typhoid many a villager volunteered for much needed care and round the clock nursing.

One approached Kakina from the north and the east to the centre of the village which was called the Cross. To the west of the Cross the road led to the Palace through the avenue of gulmohurs past the school on the right. A few metres away to the east was the Post Office opposite the market place where one could buy one's daily needs. There was a baker who made nice cakes and the cobbler made first class shoes. The road to the east of the market place had a series of typical Indian variety of flowering trees, called Mahua, and this led to a much bigger market place, Haat, where farmers in the area would sell their produce including rice, jute tobacco and seasonal fruit and vegetables twiee a week. Weavers, tailors, blacksmiths and potters would bring their products to sell and buy things they require. In the Haat transactions of hundreds of Takas would take place between the merchants and the producers. The Lipton and Brooke Bond tea companies put up stalls

for people to taste their lea and then take home free samples to induce them into the habit of drink tea.

To the north of the Cross the long stretch of road past the house of poet sheikh Fazlul Karim was dotted with mango and jackfruit trees, up to the point where the road bent and opened up to the vast field of rice crop at the side; from there the railway station was two kilometres distance away. To the south of the Cross there were dates by the road that led to Shambhu Sagar. On the north bank of Shambbu Sagar there was a couple of rain trees in front of the Samaj and a few more dates on the west bank divided by palm and hazels in between. River Tista was only a few metres away to the south of Shambhu Sagar. On the east bank of Shambhu Sagar was the girls school and the hospital. On the west bank was the residential quarters, one for the hospital chemist, one for the school headnaster and another for a clerk in the estate office, which was near the palace gate. By the palace gate was a printing works under a gulmohur tree. We called it The Press where they printed our examination papers among other official matters of the Estate Office which was virtually next door beside the hill.

In front of the Estate Office there were exotic summer fruit trees which bore fruit that anyone could pick and enjoy, the idea being that people travelling from far away places, in the hot sun, on business to the estate office could refresh themselves sitting under the tree. But most attractive was the huge bell that was struck by a man from the Estate Office every quarter of an hour, announcing the present time. One could hear the sound three to four kilometres away. We waited for the ten o'clock bell and then went for a quick dip in Shambhu Sagar or Tista before going to school. It was a procession of pupils and teachers walking to the school from all directions before the school bell went at 10.40, finishing at 4.25, with a 35 mumute recess at midday which was adjusted for 70 minutes on Fridays to allow prayer time for the Muslim pupils. In summer we had school in the morning only.

At the Caross on the south side of the road to the palace there was the theatre hall. It was used mostly by the students of Rangpur Polytechnic who came every winter for their surveying field work and other parties who came in the autumn to present folk songs and drama. The other use of the theatre hall was as a kind of pavilion, in addition to the one at the school, for football teams coming to participate in tournaments, and for emergency accommodation of the touring army recruitment officers and grow more food campaigners during the war. Also the elders who formed a society to look after the interests of the local people used to have their meetings there. Opposite the theatre hall was the Tax Caollector's office, which had attached residential quarters for the clerks. Behind the theatre ball there was large pond where two swans lived. They made shrilling sounds in the middle of the night. It was frightening. Equally frightening was the sound or the hyenas that hyenas that traveled down from the Himalayan foothills every winter and lived in bushes here and there. These animals scared everyone so much that all young children were frightened to come out of their homes after dark. Every now and then one would hear stories or someone losing calves and goats.

One winter afternoon we were having our maths lesson under one of the bakul trees when two men one of whom was from the family of poet Fazlul Karim, went carrying a gun in hand, past us.
The teacher became very excited at the sight of the gun and said ‘let`s go and kill the tiger. So, we all went equipped with boy-scout staves, ropes and whistles following the two men. When we reached the spot - supposedly the resting place of the tiger by day - the man with the gun climbed up a tree which was beside a little pond in the bush, and began to survey the situation. By this time more people joined us carrying sticks and drums, either for sports or fun. We got the signal from the man on the top of the tree to divide and circle the pond from all directions and gradually approach the centre. People started to beat tins and drums to frighten the tiger expecting the animal would come out of hiding and the man would shoot. We began to move closer to a central point. A person in front of me took charge of the final operation and was giving direction. As he was about to jump across an overgrown ditch with his staff, the animal actually shot out under the stalf and struck the back of the drummer with its claws, ran through the tobacco fields nearby, towards the palace , scaring women who had gone to fetch water from the well in the field (usually dug for watering tobacco). The hunter came down, disappointed, from his advantageous point, but seemed glad to discover that it was not tiger, but a cheetah. As the sun set and so soon it would be dark, he called off the operation and asked everyone to go home, saying that the cheetah would definitely be up all night, on the trees behind the palace, and that no one should go near it at night. Later we saw the claw marks on the man's back. The victim became a sort of subject of exhibition in the market that evening people began to suggest we should take him to hospital as they were more anxious to save his life than kill the cheetah.
Like the cheetahs and hyenas, we were visited, every now and again, by the military personnel from the nearby Lalmonirhat aerodrome who were there to combat japanese attacks in the eastern zone; it was the time of war. Refugees were arriving at Lalmonirhat every day, fleeing their homes. The presence of military persomel in Kakina became increasingly common sight, causing concern among the residents. Agroup of officers came to visit the school one aftternoon, they seemed to enjoy their visit. They signed the Visitor's Book with very kind words. They were in high up ranks, - I knew the meaning of the number of stars on their shoulder. My uncle was in the active service veterinary corps.

One summer afternoon we were playing football on the A team's ground when suddenly an aeroplane appeared in the sky above us and started circling. It looked as though it wanted to do an emergency landing on the B team's ground. We were so excited at the sight of an aeroplane, so close, we gave up football and gave chase to the aeroplane. It then went towards the river. Like many others we ran to see what was happening. People working in the fields, (of mainly Jute at that time of the year), dropped their tools and began to run towards the sands, by the river, where the plane had crash landed. We followed them. When we finally arrived there, we had an anxious look at the inside of the aircrafl whose wheels plunged into soft sand. The pilots had left and walked towards the Cross long before we arrived When we returned, we saw them sitting in the garden of our doctor's house. They were talking to Dr. Dasgupta and the Headmaster, who was a great

friend of the doctor. I heard one of the pilots saying that he came from North Carolina and he showed them a photograph of his wife, who was expecting a child in two months. It was geting dark and they must return to Lalmonirhat. Dr. Dasgupta's daughter, two classes seniot to me at school, brought something for them to eat and drink before they left for the railway station. They did not have money with them, so the Headmaster lent them some. Next day at school our English teacher talked on American classics, these were slightly out side the syllabus, but he always passed the limits of any syllabus. Two days later an envelope arrived coutaining money, more than the amount lent, and a very nice letter with it.

When the war ended it was the time for the officers to go home. One morning a jeep loaded with books arrived at the Headmaster's house. I lodged in his house during all my four years at Kakina. I came out of the house with the sound of the jeep. The officer, who visited the school before, came out of the motor, walked up to the door and asked if it was the right house. At which point the Headmaster himself came out to receive the visitor. The officer went in and sat on a deck chair and started talking. He had a cup of tea. Afterwards he took us to the jeep and presented us with a couple of boxes, full of books of English literature, for the school library. The driver unloaded the books. The officer look some cine photograph of us and our house and bade goodbye. It was a Sunday.

Living in lodgings for the purpose of attending school was quite common in that part of the country, where good schools were few and far between. People helped each other in the promotion of children's education, often in exchange for some light work, but no money was involved, though in those days of war it was difficult to support the idea without financial strain. People wore torn clothes, ate one meal a day and went to bed at sunset, for paraffin (known as kerosene there) to light up a lamp in the night was scarce. I would rise very early, before dawn, and wait for the first daylight to be able to study. The Headmaster had a cow, which I looked after, but he had to give her away as he could not afford to keep her. He remorsefully said to me one evening that nearly all his salary went to buy food for the humans let alone for the animal. I said this to my father. He then arranged to supply. now and again. food and clothing just enough to meet his needs.

Like the school's excellence in education the palace was the epitome of grace and cultural heritage. The octagonal parlour beside the study was accessible to visitors occasionally. The study, music room and billiard room also were. The parlour had a huge collection of white and black marble figures of human beings and animals, on mahogany tables with marble tops, positioned in spaces between the windows, portrails and paintings on the wall and there was a huge crystal chandelier on the ceiling. It was grand. There were beautifully curved chaises lounges on the white marble floor. I could imagine the romantic atmosphere it must have created with candles in the chandelier and blue curtains drawn at night.

In the study there were glass cases containing collections of crystals and china. There were Dutch, Chinese and Japanese potteries, they looked valuable. The tall book cases contained bound volumes which never attracted me at that time, but was always tempted

to sit down for a while at the fashionable desk inlaid with ivory. The study had carpets on the floor.

In the music room there was a grand piano on one side and some carpets rolled up on the other side. connot remember anything unusual there, except a set of tablas covered with a dusty cloth cover. The tradition of musical entertainment. I was told, would include invited musicians and dancers from Beneras or Lucknow Aristocrats would be invited to join in these musical sessions. They would sit on gaudi leaning back ward against bolsters and smoking hookka, whilst watching the cnchanting dancers and enjoying the accompanying music at night. It was customary to show your appreciation by giving tips which were in the form of gold.

The billiard room was big. Surrounding the table there were a few chairs in the room. On one well was the score board. On one side of the room there was a kind of arrangement which I guess was for some provision of facilities for indulgence, which would be much enjoyed by the aristocrats at that time.

The building was shaped like an L. One wing was the living quarter. Visitors were not allowed there and therefore I never knew how it looked. But I was told it had bathrooms of marble, one of which was a private dressing room, ornamental decorations and Belgian mirrors. Maids would carry water for bathing, bring perfume and wait on the princesses to carry out errands. At the time when I was in Kakina a certain part of this wing was the living quarter of the Manager of the Estate Office, because the princesses, the heiressed of the Estate lived elsewhere.
The garden in the front was practically open to visitors except when the caretaker was around. It was well planned with a colourful landscape. It had azaleas, rhododendrons, bougainvillaea, hibiscuses, palms, a couple of date and coconut trees. A rose garden enclosed by a brick wall was in the corner on the left as one entered through the main gate. I could never fathom the reason for hiding the rose garden from view. But if one entered climbing the steps one would see the beautiful arrangement of beds, with paths along the wall, against which were the sunflowers and dahlias. There were roses of many different varieties and colours flowering round the year, and there were seats to sit down and enjoy the grandeur. On the north side of the front lawn there were tropical shrubs and climbers, that provided a spectacular display of colours one could see from the octagonal parlour and the study. There were beds of marigold, chrysanthemum and cosmos, and a couple of colourful bougainvillaea were in the middle of the lawn. It was a delightful feeling to be in the garden. The back garden had only fruit trees.

কবি শেখ ফজলল করিম(১৮৮৩-১৯৩৬)

(কবি শেখ ফজলুল করিমের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৩ ও ১৪ এপ্রিল কাকিনায় দু'দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানমালার আলোচনা সভায় শেখ ফজলল করিমের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে মূল প্রবন্ধ রচনা ও উপস্থাপন করেন প্রফেসর আবদুস সালাম। প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুন্ন রেখে মুদ্রিত হলো)

-

আজ একটি ঐতিহাসিক ও দুর্লভ মুহূর্তে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কারণ এমন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আজ যে কবিকে স্মরণ করা হচ্ছে, বিশেষ করে এমন গুণীজনের সমাবেশে, এমনটি আমি ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমলে দেখিনি এই কাকিনায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে না।

আজ আনন্দের দিন এই কারণে যে ঐতিহ্যচেতনায় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না। বরং নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছি। কবির আপন বাসভূমের বর্তমান জীবিতজন ও নতুন প্রজন্মের বহু তরুণ এগিয়ে এসেছে। তাই এই উদ্দীপনায় রং লেগেছে। আমরা চাইব, এ দিপ্তী ছড়িয়ে যাক সবখানে।

কবির পরিবারের প্রথম পুরুষ জশমত উল্লাহ সর্দার। বাল্যে শুনেছি তার দুই পুত্র আমানতুল্লাহ আমানত করে গেছেন। ছোট আমীরউল্লাহ আমীরী করে গেছেন। আমীর উল্লাহর পাঁচ পুত্রের মধ্যে শেখ ফজলল করিম দ্বিতীয়। আমার বাবা চতুর্থ। কবিবংশের চতুর্থ প্রজন্মের আমি শেষ পুরুষ। পঞ্চম প্রজন্মের প্রায় সবাই বেঁচে আছেন। এখন সপ্তম প্রজন্ম চলছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের কবি পুরুষটি এই আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে দেদীপ্যমান।

১৩২১ বাংলা সনে ভারতবর্ষ পত্রিকায় ৩২ বছর বয়সে তার 'স্বর্গ ও নরক' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। মাত্র ছ'টি পংক্তি নিয়ে সুগঠিত কবিতাটি অপূর্ব বাক সংযমের প্রকাশ। 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়
আত্ম গণ্ডানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি প্রেমের পূণ্য বাঁধনে মিলি যাবে পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।'

এটি ব্রিটিশ আমলে স্কুল পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রজন্ম পরম্পরায় এটি স্মরণে বা স্মৃতিতে লগ্ন হয়ে আছে। যে কোন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার স্মৃতি সংলগ্ন কবিতাটিকে সামনে আনবেন। কি আশ্চর্য! অবাক লাগে, এই একটি কবিতা একজন কবিকে কতটা সাফল্য এনে দিতে পারে। কতটা স্বীকৃতি, কতটা প্রাপ্য একজন কবির সুকৃতিকে এমন মুগ্ধ প্রশংসায় চিরজীবী করতে পারে। এই কারণে সর্বজন গ্রাহ্য এই কবিতার কবিকে আজ তার ১২৬তম জন্মদিনে আমাদের প্রাণের তাগিদে অভিনন্দিত করি, করছি এবং চিরকাল করব। কিন্তু একটি কবিতা এক কবিকে হয়তো কবি করে না। কবির গ্রন্থ তালিকায় ৫৮ বা ৫৯ খানি বই এর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে-

১। তৃষ্ণা- ১৯০০ খ্রী: (এক রাতের রচনা)- ১৭টি কবিতা।
২। পরিত্রাণ কাব্য- ১৯০৪ খ্রী: (অমিত্রাক্ষর ছন্দে : জীবনী)।
৩। ভগ্নবীণা- ১৯০৪ খ্রী: (পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১)
৪। ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী (রাজা মহিমারঞ্জনের প্রয়াণে) ১৯১১ খ্রী: (কাকিনা সাহাবিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে প্রকাশিত)।
৫। গাঁথা- ১৯১৩ খ্রী: (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮)- এই মোট ৫টি কবিতার বই এর দেখা মেলে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় 'শেখ ফজলল করিমের কবিতা।' এটি একটি সংকলন। শেখ ফজলল করিম রচনাবলী গ্রন্থে ৬৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শেখ ফজলল করিমের প্রায় শতাধিক কবিতা কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক আবদুস সালামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ৫০ বছর পূর্বে সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহ থেকে ৩৮টি কবিতা নিয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কেন ৩৮টি মাত্র কবিতা, কেন আবদুস কুদ্দুসের সম্পাদনায়, সেটি পৃথক বিষয়। আজ সে কাহিনী কথনের সময় নেই। তবে যে সব পত্রিকায় এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো উঁচুমানের পত্রিকা ছিল। কিছু নাম উলেণ্টখ করছি : ভারতবর্ষ, নবনূর, কোহিনূর, বাসনা, আরতি, কল্পতরু, সওগাত, মসজেদ, মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শিশু সাথী ইত্যাদি। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আমার প্রফেসর ড. আশরাফ সিদ্দিকী এই সংগ্রহ থেকেই বাছাই করে ছোটদের কবিতা' নামে একটি শিশুতোষ কবিতার বই বের করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী সমর পাল নূর লাইব্রেরি বা 'চমচমের' তথ্য না জেনে দিয়েছেন। না জেনে দেয়া এমনি অনেক তথ্য বিভ্রান্তির তালিকা করা যায়। শেখ ফজলল করিমের বাড়ি, শয়নকক্ষ, পরিবার, রচনাবলী, আত্মচরিত প্রভৃতি

বিষয়ে অনেক প্রকাশিত তথ্য বেদনাদায়কভাবে ভুল। আজ সে আলোচনা নয়। স্বর্গ-নরক কবিতা ও তার কবির প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছি এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছি এই বলে যে, 'ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায় দামাল ছেলের মতো', বা ফুলকুল তুলতুল গা ভেঝা শিশিরে', 'রিমঝিম রিমঝিম শাওনধারা' এমনি কিছু পঙতির কাব্য মাধুর্য আমাদের প্রীত করেছে বটে তবে রোমান্টিক প্রকৃতি প্রেমিক কবির আরো অনেক কবিতা কেন পেলাম না- এই প্রশ্ন জাগে।

'আমার জীবন চরিত' কবির এই অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীটি ছাত্রাবস্থায় খুঁজে পাওয়ার পর আমার অনার্স শিক্ষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশ করেন। এই প্রথম তৎকালীন পাকিস্তানে শেখ ফজলল করিমের মূল্যবান জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ পায়। সাহিত্য জীবনের শুর“টা এবং পারিবারিক তথ্যাবলী এবং কবি বংশের অজানা অনেক তথ্য দেখবার, জানবার সুযোগ ঘটে পাঠক, গবেষক এবং লেখকদের। এরপর দেখেছি কবির কথাকে নিজের কথায় রূপান্ড়রিত করে অনেক লেখক দায়িত্ব শেষ করেন। এমনকি বাংলা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে প্রকাশিত ড. গোলাম সাকলায়েনের শেখ ফজলল করিম' গ্রন্থটি তেমনি খবর দেয়া মাত্র। যেমন আমি এখন দিচ্ছি। কেউ কি ভাবেন মাত্র ২১ বৎসর বয়সে বলতে গেলে তর“ণ এক অপরিপক্ক লেখকের কাছে প্রত্যেক মাসে ১০০/১৫০ খানা চিঠি কেন আসতো? মুসলমান সমাজ বাংলা সাহিত্যে অনেক ঐতিহাসিক কারণে পিছিয়ে পড়েছিল। মুসলমানের ভুল ভাঙতে অনেক দিন দেরি হয়ে যায়। এতদসত্বেও এত আগ্রহী পাঠক? এত Interest দেখিয়েছিলেন কেন? অথচ, কবি বলেছেন, 'মানসিংহ' প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি মানে 'আলহার“ন' নামক বিস্ড়ৃত জাতীয় ইতিহাস, নাট্যকাব্য, প্রেমের স্মৃতি, মানসিংহ, ভগ্নবীণা, যীশু খৃস্টের জীবনী, সমালোচনা, ছামৌ তত্ব, পৌত্তলিকতার পরিণাম ও একেশ্বরবাদ, তিস্ড়ৃপারের জীবন কাহিনী নিয়ে ত্রিস্রোতা (উপন্যাস) প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্ড়ক তিনি তখন লিখে ফেলেছেন। এর মধ্যে ২/১ খানি ছাপা হয়েছিল। অবশিষ্টগুলি অর্থাভাবে তখন অপ্রকাশিত। ভাবুন এত স্বীকৃতি, বনেদী পরিবার কিন্তু বই প্রকাশের অর্থ জোটে না। ২০ বছর বয়সের তর“ণ কিংবা তারও চেয়ে তখন কম বয়স। ভারত সঙ্গীত সমাজের সাহিত্যসেবী সম্মিলনে আমন্ত্রিত হচ্ছেন। কি আশ্চর্য কবির উক্তি-'আমি সাহিত্য সাধনায় আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ অরণ্যে বিস্মিত করে, শুধু বিস্মিত নয়। অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

আরো অনেক মনোবেদনা আমাদেরও আছে। সারারাত মাঝে ২/১ ঘণ্টা ঘুম; কবি পড়াশোনা করে যাচ্ছেন। অক্লান্ড় পরিশ্রম। সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা, প্রকাশনা, সাহাবিয়া প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন, বাসনার মতো উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশ, মুসলিম সমাজে সাহিত্য শাসিত র“চি, চিস্ড়ার চাষের জন্য তিনি পথ দেখাচ্ছেন। পাথেয় সংগ্রহ করে দিচ্ছেন। তার প্রথম উপন্যাস 'লাইলি-মজনু' যখন লেখেন তখন তার বয়স কত! মাত্র ১৭ বৎসর। প্রথম গদ্য রচনা। ৮ম সংস্করণ বেরিয়ে গেল। কবির গদ্যের পরিপাট্য, মধুরতা, সিম্ফনিতে এক নতুন গদ্যতালের সৃষ্টি হলো। আসলে তিনি গদ্য লেখক। বিদ্যাসাগরকে আমরা যেমন বলি গদ্যের জনক। ফজলল করিমের অর্ধশত পুস্ড়কের মধ্যে ক'খানাই বা কাব্য। সবইতো গদ্য। তিনি চমৎকার একজন গদ্য লেখক। বিশেষ করে তার গদ্যের নিজস্ব স্টাইল ছিল; সুষমা ছিল, যা প্রচারধর্মী নয়। অন্ড়ঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। তবে কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে। আমরা কবি শেখ ফজলল করিমকে কোথায় খুঁজব। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন, ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়। যেমন তিনি আফগানিস্ড়ানের ইতিহাস লিখেছেন। উপন্যাস, নাট্যকাব্য, গদ্যকাহিনী, প্রবন্ধ-নিবন্ধ যাবতীয় গদ্যশৈলীর চর্চা করে গেছেন।

এবার তার রচনার বিষয়বস্তুতে আসি। তার নীতিবাদ, আদর্শবাদিতা তাকে 'নীতিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করে। নদীয়া সাহিত্য সভা তাকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া অসংখ্য রৌপ্যপদক এবং আরো নানা উপাধি। যেমন কাব্যভূষণ, সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর ইত্যাদি। তার কিছু গ্রন্থের বিষয় নাম থেকেই বোঝা যেতে পারে। যেমন- রাজর্ষি এব্রাহিম, বিবি খদিজা, বিবি ফাতেমা, পয়গম্বরগণের কাহিনী, মহর্ষি হজরত আবদুল কাদের জিলানী (র.), মোহাম্মদ চরিত , বিবি আয়েশা, বেহেস্ড়ে ফুল, চাঁদ বিবি, ওমর খৈয়ামের অনুবাদ, পান্থশালা, পরশমণি, যীশু খ্রীস্টের জীবনী সমালোচনা, পৌত্তলিকতার পরিণাম ও একেশ্বরবাদ ও হাতেমতাই এর গল্প। এই স্রোতধারায় বাইরের মাথারমনি, উচ্ছ্বাস, কমলাদেবী, মানিকজোড় (অনুবাদ), ছেলেদের সেক্সপিয়ার, বাগ ও বাহার, প্রতিদান (উপন্যাস), প্রতিশোধ (উপন্যাস), কান্ড়ামা (সম্পাদিত) পুঁথি। বাঙলা একাডেমী থেকে 'শেখ ফজলল করিম রচনাবলী'তে পথ ও পাথেয়, খাজাবাবার জীবনচরিত, বিবি রহিমা, পয়গম্বরগণের জীবনী, আবদুস সালাম কর্তৃক সংকলিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী সংকলিত হয়েছে। রচনাবলীর সূচিপত্রে সম্পাদিকা ভুল করে 'ধ্র“বতারা', 'কুসুমকলি' নামে দু'টি বইয়ের নাম দিয়েছেন। আসলে এ হচ্ছে কবির কবিতা বিভাজন করতে গিয়ে কবিতাবলীর আমার দেয়া চারিত্রজ্ঞাপক নাম, বই এর নাম নয়। রচনাবলীতে মোট নয়টি বই পুনঃমুদ্রিত হয়েছে, যা আমাদের কাছে ছিল। প্রশ্ন- বাকি বইগুলি কোথায়? কত প্রকাশিত , কত অপ্রকাশিত? অনেক গ্রন্থের প্রকাশকাল না থাকায় এ প্রশ্ন জাগে। ৫৩ বছর বয়সে কবি মৃত্যুবরণ করেন। অথচ, তার মৃত্যুর পর তার এমাত্র পুত্র ডা. মতিয়ার রহমান (হোমিওপ্যাথ)-এর কাছ থেকে নূর লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা মঈনুদ্দিন হোসায়েন (নূর লাইব্রেরি পাবলিশার, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা), বহু পান্ড়ুলিপি নিয়ে

গেছেন। কেন? এবং সেগুলি কোথায়? ১২ বছর বয়সে 'সরল গদ্য বিকাশ' লিখে যার সাহিত্যে যাত্রা, ৫৩ বছরে এত পান্ডুলিপি এত অপ্রকাশিত থাকল কেন। তবে কি কোন সাহায্য মেলেনি। কোন সহায়তা? কোন প্রকাশক বা আরো বেশি প্রকাশক নেই কেন? কত প্রশ্ন এমনি জাগে, যার কোন উত্তর নেই। মহাকাল যেন নির্বাক। কোথায় গেল সেই অমূল্য প্রাণান্ড়কারী পরিশ্রমের ফসল? শেখ ফজলল করিম রচনাবলী সমগ্র হলো না কেন? বাঙলা একাডেমীর শেখ ফজলল করিম রচনাবলী (২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশ)। এই প্রশ্নকে আরো বেশি উদ্যত করে, আরো মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া গ্রন্থটি বহু প্রমাদপূর্ণ। যত্নের সঙ্গে বইটি প্রকাশ করা হয়নি। অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল যাতে তথ্য বিভ্রান্ড়ি না ঘটে। এই তথ্য বিভ্রান্ড়ির কথা পূর্বে একবার উলেণ্ঢখ করেছি। ঢাকা থেকে আসা জাতীয় কোন বিশেষজ্ঞের কাছে প্রার্থনা করলেও এর উত্তর মিলবে না। কারণ শেখ ফজলল করিম সম্পর্কে এ পর্যন্ড় যারা লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রয়াত আবদুল হাই, ড. আনিসুজ্জামান, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. এনামুল হক (প্রয়াত), ড. আবদুল মান্নান (প্রয়াত), ড. মুন্ড়াফা নূর"ল ইসলাম প্রমুখ অসংখ্য গুণী মানুষ; প্রত্যেকেই তথ্যাভাবে ভুগে অগ্রসর হতে পারেননি। সম্প্রতি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) থেকে ফাহিমা বলে একজন ছাত্রী 'শেখ ফজলল করিম- জীবন ও সাহিত্য সাধনা' অভিসন্দর্ভ (থিসিস) জমা দিয়ে এম ফিল ডিগ্রী পেয়েছেন। এই ছাত্রী কাকিনায় ও ঢাকায় আমার কাছে তথ্যের জন্য বহুবার টেলিফোন ও সশরীরে এসে যোগাযোগ করেছেন। সাধ্যে যা আছে সাহায্য করেছি। ডিগ্রী প্রাপ্তির পর তার আনন্দ উচ্ছ্বাস আমার মনে পড়ে। তাকেও সকলের মতো ভুগতে হয়েছে। অবস্থাটা যেন এমন যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই.....।

এবার মনে হচ্ছে লেখার সুরটা একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। এক/দু'দিনে এই লেখা। হাতে কোন বইপত্র নাই। সবই ঢাকায়। যা মনে হয়েছে সেই অনুভবের বা আবেগের লেখা আর কেমন হতে পারে?

ফজলল করিম যে কালে বাস করেছেন তা থেকে আমরা শতাধিক বৎসর দূরে এসে পড়েছি। বিশ শতকের প্রথম লগ্নে তার প্রবেশ ঘটেছিল। যে পৈত্রিক বাড়িতে তার জীবন-যাপন, যে কাকিনায় তার শিক্ষা গ্রহণ ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল তার আবহ বা পটভূমিকা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারছি না। তার কর্ম, তার পরিশ্রম কাকিনাকে গৌরবে ভূষিত করেছে, স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

রঙ্গপুর দিক প্রকাশ

শামসুল হক

রংপুরের প্রথম সাময়িকপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'। এটি বাংলাদেশেরও প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র। পত্রিকাখানি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দীর্ঘ দশ বছর চলার পর ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং-এর মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক আইনের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' রংপুরের দ্বিতীয় সাময়িক পত্রিকা। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'-এর মত এটিও ছিল সাপ্তাহিক। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় তিন বছর পর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস) রংপুর জেলার (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলা) কাকিনা গ্রাম [(স্বনামধন্য কবি শেখ ফজলল করিম-এর জন্মস্থান) থেকে 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' রংপুর জেলায় প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্রিকা হলেও ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'কবিতা কুসুমাবলী'রও (প্রকাশিত ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মে মাস) এক মাস আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' যেমন কুন্ডি পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল, 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ'ও তেমনি কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে তারিখের সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা যায় :

জেলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভুগোলক বাটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিক প্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক সমাচারপত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার এক খন্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) থেকে জানা যায় যে, রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ভট্টাচার্য। তিনি ১৮৬৫ সালের গোড়ার দিকে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করেন। উক্ত সনের ১৯ এপ্রিল 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা (প্রথম মাসিক, পরে সাপ্তাহিক) পাঠে জানা যায় :

রঙ্গপুর দিক প্রকাশের পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'রঙ্গপুর অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান, তিনি পুনরায় রঙ্গপুর প্রত্যাগত হওনাবধি একদিনের জন্যও স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ...মফস্বলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত সর্বপ্রথমে শম্ভু বাবু করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে মফস্বলে বাঙ্গলা ছাপাখানা ছিল না।

এরপর 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অকস্মাৎ কাকিনা রাজ কাচারির ১৯১২ ও ১৯১৪ সনের দুই খন্ড রোবকারী' আমাদের হস্তগত হয়। রোবকারী দু'খানি পড়তে গিয়ে 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ'-এর পৃষ্ঠপোষক এবং প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শেখ ফজলল করিম সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রোবকারী থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো প্রসাঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত ও আলোচনা করা গেল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের রোবকারীতে উলেণ্টখ আছে ঃ

স্থানীয় সংবাদপত্র দিকপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক অনেক দিবস হইতে রোগে শয্যাশায়ী। তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত সরকার দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে মাসিক ১৫/- টাকা পেনশন দিয়াছেন। সম্পাদকেরও স্বাস্থ্য প্রায় ভঙ্গ হইয়াছে। অতএব একজন নতুন সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত না করিলে প্রেস বন্ধ হইয়া যাইবে। (কাকিনীয়া রাজকাছারী চাকলে কাকিনীয়া ... ১৯১২ সালের ১৯ জানুয়ারি, পৃ ৩)

দুর্ভাগ্যবশত উপরিউক্ত তথ্য থেকে সহকারী সম্পাদক বা সম্পাদকের নাম জানা যায় না। রোবকারী থেকে ওপরে উদ্ধৃত তথ্যের পরেই বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের স্থান ও গুরুত্ব কিরূপ ছিল, তা ব্যক্ত করা হয়েছে :

বঙ্গদেশের মধ্যে দিক প্রকাশ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার বর্তমান বয়স প্রায় ৫২ বৎসরের উর্ধ্বে চলিল। বাঙ্গলা কোন সংবাদপত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল পর্যন্ত অবিরাম পরিচালিত হইয়া আসিতে দেখা যায় না। ইংরেজী সংবাদপত্রের মধ্যেও অর্দ্ধ শতাব্দীকালের পূর্ব হইতে সমভাবে পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যাও কলিকাতা অথবা বাঙ্গলার অন্য কোন স্থানে খুব অল্পই আছে। সম্ভবত ৪/৫ খানার অধিক হইবে না। তাহাও সাপ্তাহিক এবং দৈনিক একত্র করিলে হইতে পারে। অতি অল্প দিবস পূর্বে এতদ্দেশবাসী দ্বারা ইংরাজী ভাষাতে যে সকল সংবাদপত্র পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে Indian Mirror-এর Jubilee উৎসব সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং Indian Mirror অপেক্ষাও দিক প্রকাশের বয়স ২/১ বৎসর অধিক হইবে। প্রায় ৫৩ বৎসর পূর্বে রঙ্গপুর জেলার কাকিনীয়া গ্রামে একটি সংবাদপত্র স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল, ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে এবং ঐ ঘটনা দ্বারা ঐ স্থানের এবং কাকিনীয়া রাজবংশের যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও সামান্য শণ্ঘাঘা এবং আনন্দের বিষয় নহে। (রোবকারী কাকিনীয়া রাজকাছারী চাকলে কাকিনীয়া .... ১৯১২, ১৯ জানুয়ারী, পৃ ৩-৪)।

রোবকারীতে রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ পত্রিকাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকারূপে দাবি করা হয়। কেদারনাথ মজুমদার তাঁর সাময়িক সাহিত্য প্রথম খন্ডের ৪৩৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪৪৩ পৃষ্ঠায় বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের তালিকা দিয়েছেন এবং অধিকাংশের বয়সও উল্লেখ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, সোম প্রকাশ (১৮৫৯) ২৭,৭ বৎসর, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) ২২ বৎসর এবং বঙ্গবন্ধু (১৮৭০) ৩৬ বৎসর জীবিত ছিল। ইংরেজি পত্রিকা ইন্ডিয়ান মিরর ১৮৬১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) প্রকাশ করেছিলেন। মনোমোহন ঘোষ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। পত্রিকাটির জন্মকাল হিসাব করলে জানা যায় যে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির জুবিলী হয়েছিল।

রোবকারীর পরের বক্তব্য থেকে দিকপ্রকাশের প্রতিষ্ঠাতা কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর চরিত্র, বিদ্যানুরাগ ও পত্রিকার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ, অপর পক্ষে দিকপ্রকাশের প্রতি শম্ভুচন্দ্রের বংশধরদের কি কর্তব্য হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার কর্তৃত্বের সময়ে দিকপ্রকাশ স্থাপিত করেন। তিনি স্বয়ং যেরূপ মহাজ্ঞানী এবং বিদ্যানুরাগ তাঁহার যেরূপ বলবতি ছিল, এতদ্দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁহার যেরূপ দৈনিক সাধনার বিষয় ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার প্রজা এবং আশ্রিতবৃন্দের মধ্যে জ্ঞান বিকাশ তাঁহার যেরূপ অদম্য ইচ্ছার বিষয় ছিল তাহাতে এই দিকপ্রকাশ যে তাঁহার প্রাণতুল্য হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না। যে মহাত্মার কৃপা এবং কীর্তির ফলে কাকিনীয়া গ্রাম একটি নগরের তুল্য হইয়াছে এবং শ্রী ধারণ করিয়াছে, যাহার প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহিতার ফলে বিদ্যালয় প্রভৃতি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে এই স্থানে স্থাপিত হইয়া জ্ঞান বিকাশ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই মহাত্মার একটি প্রাণতুল্য প্রিয় সামগ্রী যাহার রক্ষার ভার তাঁহার বংশধরেরা পাইয়াছেন, তাহা যদি রক্ষিত না হয় তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষেই বর্ণনাতীত পরিতাপের বিষয় হইবে। কেবল পরিতাপের বিষয় নহে, কাকিনীয়াধিপতি মনে করেন যে, উহা কলঙ্কেরও বিষয় মনে করা উচিত। যে পূর্ব পুরুষ মহাত্মাদিগের সুনাম এবং সুকৃতির ফলে আমরা আরও নানা বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি এবং স্থান উন্নত হইয়াছে তাহাদিগের যে সকল অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল এবং যাহার রক্ষার ভার পরিবর্তী কাকিনীয়া ভূপতিগণের প্রতি ন্যস্ত তাহা রক্ষা করা এবং অখন্ড রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এক রাজত্বকালের কীর্ত্তিকলাপ যদ্যপি পরিবর্তী রাজত্বকালে এবং ভবিষ্যতে সুযতনে রক্ষিত না হয় তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ ত্রুটি হইল নিশ্চয়ই মনে করিতে হইবে। কর্তব্য পালনে অবহেলাই পাপ বলিয়া পরিগণিত, পাপের ভার যতই বৃদ্ধি হইবে অমঙ্গলের সম্ভাবনা সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেবল তাহাই নহে পূর্ব পুর"ষের বিশেষভাবে ব্যক্ত সদিচ্ছা বা আদেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কোনরূপে শুভ ফল প্রদায়ক নহে। আরও এক বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যদি বর্তমানে নির্বিঘ্নে এরূপ প্রদর্শন করা যায় তাহা হইলে উপস্থিত সময়ে যে সমস্ত কীর্তি এবং কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহা পরবর্তী শাসনকালে রক্ষিত হইবে এবং তাহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করা হইবে এরূপ আশা করার কোন অধিকারই থাকে না। সেই জন্যই প্রত্যেক স্থায়ীভাবের কার্য্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই উহা ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। রাজ সমীপে সর্বদাই নানা বিষয়ের আবেদন উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন বিষয়ের চূড়ান্ত আদেশ প্রকাশ হইতে প্রায়শই বিলম্ব হইয়া থাকে। এ কারণে সাধারণে অবশ্যই কিঞ্চিৎ দুঃখিত। কিন্তু কত বিষয়ে তাঁহাকে আলোচনা করিতে হয় তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। একের কর্তব্য অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাতে একটি দেশাধিপতির কার্য্যভার এবং দায়িত্ব সাধারণের উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। দিকপ্রকাশের উপলক্ষে এই সুদীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কাকিনীয়ার বর্তমান অধিপতির অন্তরতম বাসনা। আপাততঃ একটা উচ্চ শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এ যন্ত্রালয়ে অন্যান্য যে সকল

সংস্কার আবশ্যক তাহাও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। অন্যত্র হইতে একটা উচ্চশিক্ষিত কর্মচারী আনয়ন সম্বন্ধে বর্তমানে কতকগুলো অন্তরায় দেখা যাইতেছে, অতএব কাকিনারাজ আদেশ করিতেছেন যে তাঁহার পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার বি, এ, আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার এডিশনাল কর্তব্যভাবে দিকপ্রকাশের জয়েন্ট বা সহযোগী সম্পাদকভাবে কার্য্য করে এবং সেইজন্য সে আপাততঃ মাসিক ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (রোবকারী কাকিনীয়া রাজকাছারী চাকলে কাকিনীয়া... ১৯১২, ১৯ জানুয়ারী, পৃ ৪-৭)

তদানীন্তন কাকিনারাজ (মহেন্দ্ররঞ্জন রায়) বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে তাঁর জ্ঞান বিতরণের স্পৃহা ছিল। তাই তিনি কাকিনার সর্বসাধারণের জন্য সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন সংবাদপত্র পাঠ জ্ঞান আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই তিনি হুকুম জারি করেছিলেন :

এক্ষণে কাকিনীয়ার সর্বসাধারণের সংবাদপত্র পাঠের কোনই সুবিধা নাই। অতএব আদেশ হইতেছে যে, মহিমরাঞ্জন মেমোরিয়াল স্কুল অট্টালিকার একটি ক্লাশ রুম সাধারণের জন্য বেলা ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে এবং তথায় ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, ইন্ডিয়ান মিরর, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী (বাই উইকলী), সঞ্জীবনী , বঙ্গবাসী , দিকপ্রকাশ এবং মাসিক পত্রিকা নব্য ভারত এবং সময় সময় ইহা ব্যতীত অন্যান্য কাগজ এবং গ্রন্থ রাজবাটী হইতে প্রেরিত হইবে। রোবকারী কাকিনীয়া রাজকাছারী চাকলে কাকিনীয়া ... ১৯১২, ১৯ জানুয়ারী, পৃ ১০)
রোবকারীর ২৭ পৃষ্ঠায় দিকপ্রকাশের সম্পাদকের নাম ও তাঁর আর্থিক দূরবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায় :

হরশঙ্কর মৈত্রের ৮৮।। জমায় খামার হারে এক জোত রাখে তাহার বাকী ৫৪৩, এতদ্ব্যতিত তাহার আরও জোত আছে বাকীও ঐ প্রকার আপত্য তাহার কোন কোন কারণে থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত কথা সে অমিতব্যয়ি এবং খাজনা দেওয়ার তাহার অভ্যাস নাই কিন্তু বহুকাল সে পারদর্শিতার সহিত দিকপ্রকাশের সম্পাদকের কার্য করিয়া আসিতেছে এক্ষণে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে এবং রুগ্ন শয্যায় অধিককাল কাটাইয়া থাকে। পুরাতন কর্মচারী এবং সরকারের বিশেষ হিতৈষী এই সকল কারণে খামার হারের জোতের বাকী খাজনার দরুণ ৫৪১ টাকা মধ্যে ৩০০ টাকা মাপ দেওয়া যায়। এবং তাহাকে সতর্ক করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে সে আর এ প্রকার খাজনা বাকী না রাখে। এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা বেতন হইতে মাস মাস কিছু করিয়া পরিশোধ করিতে থাকে।

১৯১২ সালের ১৯ জানুয়ারির পর ১৯১৪ সালের ২৬ জুনের মধ্যবর্তী সময় কাকিনা সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা যায় না। কারণ, এ সময় কোন রোবকারী রাখা হয়নি। ১৯১১ সালের ২৬ জুনের রোবকারীতে এ কথা বলা হয়েছে এবং তার কারণ উল্লেখিত হয়েছে :
প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিগত বর্ষের রাজ্য পরিচালন সংক্রান্ত সমুদয় প্রধান প্রধান বিষয় পর্যালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে আবশ্যক মত নূতন নিয়ম এবং বিধান প্রকটন বা প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তনাদি যথা প্রয়োজন সম্পাদনপূর্বক রোবকারী দ্বারা ঘোষণা করা হইয়া থাকে এবং সদর মফস্বল রাজ কর্মচারীদিগের কার্য্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রয়োজন মত এবং সরকারের ইচ্ছাধীন দত্ত পুরস্কারাজ্ঞা প্রচার করা হইয়া থাকে। এই পুরাতন প্রথা রক্ষা করিতে বর্তমানে কাকিনাধিপতি অনিচ্ছুক নহেন। যদিও উহার বিরুদ্ধে কতকগুলো যুক্তি দর্শাইতে পারা যাইতে পারে এবং স্বর্গীয় কাকিনাধিপতির শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর রোবকারী প্রকাশ করা হইত না, তথাপিও উহার সমর্থন পক্ষে অনেক বিষয় আছে, যাহা অবহেলা করা সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু অপরিহার্য কারণে এ বৎসর রীতিমত রোবকারী প্রস্তুত হইতে পারে নাই।
উপরিউক্ত তারিখের রোবকারীর ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় আবার দিকপ্রকাশ পত্রিকা ও তার যুগ্ম সম্পাদক সম্বন্ধে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত তথ্যে শিরোনামায় লিখিত আছে 'প্রেস' শব্দটি। তারপর শুরু হয়েছে আসল কথা :

শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয়ের পূর্বাপেক্ষা বহুল উন্নতি হইয়াছে এবং জয়েন্ট এডিটর জ্যোতিষ চন্দ্র মাজুমদার দিক প্রকাশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আন্তরিক আগ্রহের জন্য যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতেছে তাহা নিতান্তই প্রশংসাজনক। কিন্তু প্রেসের এরূপ আয় এখনও হয় নাই যাহাতে তাহাকে তাহার আশানুরূপ বেতন বৃদ্ধি দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক তাহাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়। বিবেচনায় তাহার মাসিক বেতন ৮০ (আশি) টাকা করা গেল।
কাকিনা এস্টেটের পরবর্তী রোবকারীগুলো আমরা পাইনি। তাই রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হলো না। তবে যুগ্ম সম্পাদক জ্যোতিষ চন্দ্র মজুমদার দিক প্রকাশের 'সর্ব্বঙ্গীন উন্নতির জন্য আন্তরিক আগ্রহ দেখেয়েছিলেন তাতে মনে হয় পত্রিকাখানি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুনের পরও চলেছিল।

শামসুল হক

লেখক পঞ্চাশের দশকের শুরুতে (১৯৫০-১৯৫২) অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুল হক সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া বাঙলা একাডেমীর পরিচালকসহ তিনি বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। কাকিনার পরিবেশকে ঘিরে 'নয় ছয়' নামে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

তিনি নদীর নাম তিস্তা, প্যাপিরাস, বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে মুসলিম চরিত্র, আধুনিক জগৎ ও মানববিজ্ঞানসহ আরো অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়াও তিনি শিশুতোষ ও রূপ কথার গ্রন্থ রচনা এবং অনুবাদ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তথ্য নির্দেশ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম ও ২য় খন্ড, ১৩৫৪, ১৩৫৯
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ১৮১৮-১৮৬৭, কলি, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৬, পৃ ২৫৫-২৫৬
কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম খন্ড: ১৩২৪
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন : ১৩৬৭
যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ : ১৩৫৩
বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খন্ড : ১৯৬২
শামসুল হক, বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : প্রকাশনা (বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ), ১৩০১-১৪০০ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, নারায়ণগঞ্জ, সুধীজন পাঠাগার, ১৪০০) পৃ-৩৭০

দেখেছি শুনেছি

অখিলেশ্বর বর্মা
ব্যাচ-১৯৫০

সময়টা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলেও এর ডামাডোল একেবারেই শেষ হয়নি তখনও। যুদ্ধ বিমান ঘাটি লালমনির হাট থেকে বৃটিশ, আমেরিকা ও রাশিয়া তথা মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ বিমান সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা রাত্রিতেই উড়ছেই। সেনাবাহিনীর কিছু অংশের যাতায়াতও চলছে । শহরে, বন্দরে, হাটে, বাজারে সবখানে সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধের জয় পরাজয়ের নানা আলোচনা ও গুজবের চুলচেরা বিশ্লেষণেরও মহরৎ চলছে।
এই সময়টায় আমি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র হলেও রাজবাড়ী সংশ্লিষ্ট অনেক প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীন ব্যক্তির মুখে কাকিনার ইতিবৃত্ত রাজ পরিরবারের কথা তথা রাজবাড়ীর তদানিন্তন বৈভব ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ঘটনার কথা যা শুনেছি আজও তা আমার মনে অমলিন হয়ে আছে। এ ছাড়া আমার স্কুল জীবনে কাকিনা তথা রাজ স্থাপনাগুলির যা কিছুই আমি দেখেছি তার চিত্র মানসপটে ছবির মতই গেঁথে আছে।
তখন প্রাইমারী নামে কোন স্কুল ছিল না। সাধারণ মানুষের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য ছিল প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার একটি বেসকারী পাঠশালা। অবশ্য সে সময় হাইস্কুলের আরম্ভও ছিল তৃতীয় শ্রেণী থেকে। কিন্তু সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল খুবই কঠিন। বর্তমান কাকিনা হাইস্কুলের পূর্ব পাশের পুকুরটির পশ্চিমের পাড় ঘেঁষে একজোড়া পুরানা লিচু গাছের নিচে দুই শিক্ষকের লম্বা টিনের ঘরের সাইন বোর্ডবিহীন বেসরকারী শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল কাকিনা পাঠশালা । এর আজীবন প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বর্মণ । তিনি উপেন মাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন। লোকে আজও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।
এই পাঠশালা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে আমি ১৯৪৯ ইং সালে কাকিনা হাই ইংলিশ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তখন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন উত্তর বঙ্গের খ্যাতিমান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গীরিজা শংকর মহাশয়। এ ছাড়া স্কুলটির সব শিক্ষকই ছিলেন প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ । তাদের মধ্যে টয়রা বাবু, হৃষীকেশ বাবু, প্রতাপ বাবু, লিখিল বাবু, শ্যামা শংকর বাবু, আব্দুল হামিদ মিয়া এবং শিশির বাবুর নাম বিশেষভাবে মনে আছে।
পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যায়নকালে ওই বছরেই কাকিনা চাপারতলের ডাঃ যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের (বর্তমান ডাঃ জহুরুল হকের বাড়ী) পুত্র রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাকিনা হাই স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করে হাইস্কুল তথা কাকিনাবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেন।
এদিকে রাজার স্থাপিতের সুবাদে স্কুলের ছাত্রদের রাজবাড়ীতে প্রবেশ, বাগানের ফুল ছেঁড়া ও গাছ গাছড়ার ফলমুল পেড়ে খাওয়া ছিল যেন একটি ছাত্রগত বিশেষ অধিকার। রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী সময়ে কাকিনা রাজ পরিবার কার্শিয়াংয়ে স্থায়ীভাবে চলে যায়। তিনি ছিলেন কাকিনা রাজ পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারী। তাকে আমার দেখা হয়নি। তবে, শেষ রাজার একজন কনিষ্ঠা কন্যাকে আমি কাকিনাতেই দেখতে পেয়েছি, তখন আমি হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। খুবই ফর্সা পাতলা গড়নের দামী সাদা গরদের থানের শাড়ী পরিহিতা একজন সৌম্য মূর্তির দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী পৌঢ়া মহিলা। দেখলেই মনে শ্রদ্ধাভক্তি জাগে। রাজাবাড়ীর চৌমাথায় কয়েকটা তোরণ সাজিয়ে ফুলে ফুলে কাকিনার মানুষ রাজকুমারীকে বিপুল সম্বার্ধনা দেয় এবং সেই ছিল তার কাকিনায় শেষ আসা।
আমার ছাত্রাবস্থার প্রথম অংশটা ছিল ভারত বিভাগের প্রাক্কাল। কাকিনা তখন ত্রিমুখী ভাঙ্গনে দিশেহারা। তিস্তার ভাঙ্গন, ভারত গমনেচ্ছু এবং অন্যান্য রাজ কর্মচারীদের রাজবাড়ী তছনছ করে নিজেদের আখের গোছানোর প্রতিযোগিতা এবং লোকালয়েও ভারত গমনের হিড়িক কাকিনার সাজানো গোছানো সম্প্রীতির সমাজকে তছনছ করে দেয়।
এর কয়েক বছর পর পর্যন্ত কাকিনা এবং কাকিনা রাজবাড়ীর ইতিহাস - ঐতিহ্যের সব নিদশন ও স্থাপনা অক্ষত থাকতে দেখেছি। রঙ্গিন কাঁচের জানালার একতলা রাজ বৈঠকখানা (প্যালেস) তখনো ছিল প্রায় অবিকৃত। সেখানে শোভিত থাকতে দেখেছি বড় ঝাড় লন্ঠন, দামী দামী সুদৃশ্য চেয়ার টেবিল, পাশে দুটি জার্মানীর তৈরী পিয়ানো এবং একটি পিংপং খেলার টেবিল। এই টেবিলে স্টিকসহ পিংপং বল সাজানো থাকত। বৈঠকখানা ঘরের বাইরে পশ্চিম দেওয়াল ঘেষে পড়ে থাকতে দেখেছি একটি পুরানো ফোর্ড মটরগাড়ী। এর পাশেই পাল্কির মত দেখতে দুইখানা দুই ঘোড়ার বাগী। শুনেছি মোটরখানা রাজা ব্যবহার করতেন। আর বাগী দুইটি ব্যবহার করতেন রাজা অন্দরের মহিলাগণ। এই রাজ বৈঠকখানার সামনে অর্থাৎ

পশ্চিমেই ছিল "আয়রন বাংলা" । এর সমানে ছিল একটি নাতিদীর্ঘ বৃত্তাকার ব্রায়োনিয়া নামে লতানো বিদেশী ফুলের গাছ। ফুল গাছটির নিচে ছিল কড়াই লোহার তৈরী হেলানো কয়েকটি ডেক চেয়ার। এখানে যে কোন লোকের বিশ্রাম নিতে কোন বাধা ছিল না। গাছটিতে ফুলও ফুটত অজস্র। ফুলগুলো ছিল বড় বড় পাপড়ি বিশিষ্ট বহু দলে ছড়ানো লাল বৃত্তাকার - দেখতে অনেকটা ডালিয়া ফুলের মত। ফুল ছিঁড়তে নিষেধ ছিল না। আমরা ছাত্ররা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এখান থেকে ফুল তুলে আনতাম।

রাজ বৈঠকখানার সামনেই বিদেশী ফুলের বাগান এবং পূর্ব পাশে চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় তখন আমরা কোন পশু - পাখি দেখিনি। তবে গোটাকতক খাঁচায় কয়েকটি টিয়া এবং ময়না পাখি দেখেছি।

রাজ ভবনটি (প্যালেস) ছিল চুন সুরকীর ইটের গাঁথুনি- উত্তরে দক্ষিণে লম্বা ইংরেজী এল অক্ষরের অনুরূপ। এর লাগোয়া দক্ষিণেই ছিল অবজারভিশন টাওয়ার, যেখানে থেকে রাজ মহিলারা পুজা পার্ব্বন ও মেলার অনুষ্ঠান দেখতেন। এর জীর্ণ অবস্থাতেও আমরা এর উপরে উঠে পুজা-মেলা ইত্যাদি দেখেছি।

দূর্গা মন্দিরের উত্তরে পেছনেই ছিল রাজার নিজ পুজার মদন মোহন মন্দির।

রাজা প্রাসাদটির সংলগ্ন পূর্বের মাঠের উত্তরেই ছিল রাজ দূর্গা মন্দির। সেখানে প্রতিবছর বসন্ত ও শরৎকালে পুজা হতো। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আমি এখানে পূজা দেখেছি। পুজা উপলক্ষ্যে হাট বাজার রাজবাড়ীর সামনেই বসতো। কালীবাড়ীর মাঠে হতো চৈত্র মাসে গঙ্গার বারুনী স্নান, বসতো মেলা।

রাজ ম্যানেজার হাউসটি এখনও আছে। তবে এটি এখন একটি খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্ম সমাজের এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। থিয়েটার হলটি ছিল হাইস্কুলের সামনের পুকুরটার উত্তর পাড়ে টিনের ঘরের একটি চৌচালা দ্বিতল ভবন। উপরের তলায় মেয়েদের এবং নিচে পুরুষদের বসার স্থান ছিল। আমি এই হলে শেষ থিয়েটার দেখেছি ১৯৫১ সালে।

ম্যানেজার অফিসটি ছিল রাজবাড়ীর রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু। এখানেই একপাশে ছিল অনেক বন্দুকধারী প্রহরীর পাহারাধীন রাজকোষ। অফিস সদা সর্বদাই রাজ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এবং বিভিন্ন তহশীলের তহলীলদরগণের আনাগোনায় সরগরম। এখান থেকেই দিনে এবং রাত্রিতে পিতলের ঘন্টা পিটিয়ে জনসাধারণকে সময় জানিয়ে দেয়া হতো। এই ঘড়ির শব্দে সময় নির্ণয় করে আমরাও পড়াশুনা করতাম। ম্যানেজার অফিসের ডান দিকে ছিল রাজ কর্মচারীদের কিছু কোয়াটার। এ সব কোয়াটারে কর্মচারীরা সপরিবারে থাকতেন। রাজবাড়ী থেকে সদর কাছারী পর্যন্ত রাস্তাটি ছিল ইটের কাঁকড় বিছানো অতিশয় প্রশস্ত আধা-পাকা একটি পোক্ত সড়ক।

বর্তমান কাছারী বাজারের দক্ষিণের পুকুরটির পূর্বের পাড়েই ছিল রাজবাড়ীর ডাক্তারের বাসা। এছাড়া হাসপাতালের ডাক্তার বা কেমিস্টের বাসা ছিল শম্ভু সাগরের পশ্চিমে হেড মাস্টার মহাশয়ের বাসার পাশেই।

সে সময় অধিকাংশ মানুষ পদ ব্রজেই চলাফেরা করতেন। একটু অবস্থাপন্ন ব্যাক্তিদের বাহন ছিল গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী। বিয়ে সাদীতে তখনও কোন কোন সময়ে বর-বধূর জন্য বেহারা-পাল্কীর ব্যবস্থাও চোখে পড়তো।

এ ছাড়া রাজকর্মচারী, ডাক্তার এবং অভিজাত ব্যাক্তিগণের বাহন ছিল দুই সীটের দু'চাকার একঘোড়ার ভাড়ায় চালিত টমটম গাড়ী। স্থানীয় কয়েকজন ব্যাক্তির মালিকানায় এমন কয়েকটি টমটম আমি আমার ছাত্রাবস্থার শেষ ভাগেও দেখেছি। পরে যাত্রীর অভাবে টমটমের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শম্ভু সাগরের দক্ষিণ পাড়ে ছিল কালীমন্দির । কালীমন্দিরের সংলগ্ন পূবেই ছিল একটি নাতিউচ্চ শিব মন্দির। কালী মন্দিরের পূর্ব দিকে ছিল হাওয়াখানা সড়ক।

বাজারের আগে অর্থাৎ চৌমাথার ডান পাশেই ছিল এক মড়োওয়ারীর গুদাম, বাসা এবং একটি জুট প্রেস। এর পূর্ব পাশেই ছিল জুট অফিস এবং ডাকঘর। ডাকঘরটি আজও আছে। এখানে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থাও ছিল।

ডাকঘরের উত্তরেই অনতিদূরেই উত্তর বঙ্গের খ্যাতনামা কবি শেখ ফজলল করিম সাহেবের বাড়ী।

বাজার সংলগ্ন দক্ষিণে ছিল দু'জন মাড়োওয়ারীর বাসা, গুদাম এবং জুট প্রেস। তাদের একজনের নাম ছিল প্রতাপ মল মাড়োওয়ারী। বাজারের ভেতরেও একজন মাড়োওয়ারীর দোকান ছিল।

বাজারের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় একটা ছোট চৌচালা টিনের ঘরে (বর্তমান মাছের বাজার) ছিল কাকিনা ইউনিয়ন বোর্ড অফিস। তখন ইউনিয়ন বোর্ড চেয়ারম্যানকে বলা হ'ত প্রেসিডেন্ট । প্রেসিডেন্টদের মধ্যে মিয়াজন মাস্টার, বিশ্বেশ্বর সরকার, ইউসুফ মিয়া, শিশির মাস্টার এবং রহমত মিয়ার নাম মনে পড়ছে।

আজকের কাকিনা দেখে সেদিনের কাকিনা চেনার আর কোন উপায় নেই। সেদিনের কাকিনার মাটিই কেবল আজ তার স্মৃতি বহন করছে।

লেখক- এ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট ডিভিশন

আমার স্মৃতিতে কাকিনা বালিকা বিদ্যালয়

জোবেদা খাতুন

জন্মভূমি মানুষের জীবনের পরম প্রিয় স্থান। খেলার সাথী এই জন্মভূমি। জীবনের শেষ বেলায় স্মৃতির পাতায় আজ কত কিছু না আবছা হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও অনেক ঘটনার কথা মনে করতে পারিনা ।

ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের এই কাকিনা ছিল অনেক সাজানো গোছানো। কাকিনা রাজ পরিবারকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই সুন্দর গ্রামখানি। এর সুসজ্জিত বৈচিত্র্যই একে দিয়েছিল নগরতুল্য এক গ্রামের মর্যাদা। এখানে রাজা ছিল, রাণী ছিল, ছিল রাজকুমারী। পাইক-পেয়াদা, মন্ত্রী-আমর্ত্য তাদেরও কর্মস্থল ছিল এই রাজবাড়ী। যদিও রাজা-রাণীকে আমার দেখা হয়নি।

রাজবাড়ীর সামনে বিরাট ফটক। এর ভেতরে দেখেছি প্যালেস বিল্ডিং, স্টেট বিল্ডিং, , আয়রন বাংলা, ঘুরানী দালান, আন্ধা কুঠির, রাণীর পুকুর। এরমধ্যে ঘুরানী দালান আমার খুব বেশী প্রিয় ছিল। ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে এর উপরে উঠা, উপরে উঠে অনেক দুরের জিনিস দেখতে পাওয়া কি যে মজার ছিল ।
সে সময় কাকিনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতি বেশী ছিল । তবে আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না। আমার সহপাটিদের মধ্যে খুব কাছের ছিল ষষ্ঠি দাস। ওরা বাবা শ্রী প্রতাপ দাস। ছোট বেলা থেকে পড়াশোনা, খেলা ধূলা সব কিছুতেই আমরা এক সাথে ছিলাম। পরে ও কোলকাতায় চলে যায়। শুনেছি এ বছরই ষষ্ঠি মারা গেছে। ওর সঙ্গে আর দেখা হল না।

এমন অনেক স্মৃতির মাঝে রাণী শান্তি বালা গালর্স ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আজো আমাকে নাড়া দেয়। এই স্কুলে আমার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি। আবার এই স্কুলেই আমার শিক্ষকতা করার সৌভাগ্য হয়েছিল (১৯৪১-৪৭)। স্কুলটি প্রথমে শম্ভু সাগরের উত্তর দিকে (টিন শেড ঘর) অবস্থিত ছিল। ঝড়ে স্কুল ঘরের ছাউনী উড়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে এটি শম্ভু সাগরের পূর্ব দিকে তিন কক্ষ বিশিষ্ঠ একটি বিল্ডিংয়ে স্থানান্তর করা হয়। এটি ছিল একটি উচুঁ স্থান। দেখতে ছিল অনেকটা টিলার মত। এর বড় কক্ষটিতে পাটিশন দিয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণী এবং বাকী দুই কক্ষে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ক্লাশ হতো।
বিল্ডিংটি অনেক পুরানোও ছিল। একবার স্কুল পরিদর্শক মালিহা খাতুন বিল্ডিংটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এটি অনেক পুরানো হয়ে গেছে যে কোন দিন ভেঙ্গে পড়তে পারে। এরপর ঐ বিল্ডিং থেকে স্কুলটি টিলার নিচে একটি টিন শেড ঘরে সরিয়ে নেয়া হয়। উল্লেখ্য, আমাদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য মালিহা খাতুন নামে একজন পরিদর্শক রাজশাহী থেকে আসতেন। তিনি আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্কুলে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। ভারত ভাগের পর হিন্দুরা দেশ ত্যাগের ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ, যা আজো আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কোন কক্ষ ছিল না। তারা ক্লাসেই বসতেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গীরিজা শংকর রায় মহাশয়ের মেয়ে দিপ্তি সেন। তারা দুই বোন ও এক ভাই ছিলেন। ১২ সদস্যের কমিটির অধীনে স্কুলটি পরিচালিত হতো। কমিটির প্রধান ছিলেন হাই স্কুলের প্রধান । বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সবাই নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন না। পার্ট টাইম শিক্ষকও ছিলেন দু'একজন। শোভা রায় (স্বামী-ডাঃ অমল রায়)-এর কথা খুব মনে পড়ে। বৌদি রংপুরের মেয়ে ছিলেন। বৌদির গানের গলা ভাল ছিল। সেলাইও জানতেন ভাল। লেখাপড়ার পাশাপাশি উনি স্কুলে বাচ্চাদের গান ও সেলাই শিখাতেন। বৌদির গান আমার খুব ভাল লাগত। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কও ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। পরে তারা ভারতে চলে যায়। এই স্কুলের আর একজন শিক্ষক ছিলেন মতিয়ার রহমান। ইংরেজী ও অংক ছাড়াও সে আরবী ও উর্দূতেও দক্ষ ছিলো। কাকিনা হাই স্কুল থেকে সে মেট্রিক পাশ করেছিল। এইতো সেদিন (৯ই ফেব্রুয়ারী -২০০৮) তার

সঙ্গে শেষ দেখা ও কথা হয়। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। কারণ এর কিছুদিন পর গত ২০ মার্চ ২০০৮-এর সকাল ৬-৩০ মিনিটে সে ইন্তেকাল করেছে। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।
হিমানী (মতিয়ার ডাক্তারের মেয়ে, সূফি ও রোমেলের বোন) এবং আবদুর রহমানের সহধর্মিনী ও শ্রী প্রতাপ বাবুর মেয়ে রওশন আরা বেগম টেপু এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছে।

বুধ বুড়ির নাম খুব মনে পড়ে। ও ছিল স্কুলের আয়া। বর্তমান মাছুয়া পাড়ায় ওর বাড়ী ছিল। বুধ বুড়ী দূরের মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতো। আবার ছুটির পর তাদেরকে বাসায় দিয়ে আসতো। এছাড়া স্কুলের অন্যান্য কাজও সে করতো। লেখা পড়ার পাশাপাশি স্কুলে খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত হতো। ছাত্রীদের মাঝে মেধাভিত্তিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পুরস্কারের মধ্যে প্রধানত: ছিল বই ও খেলনা।

এখানে নেন্দু ভাইয়ের নামও আমি উল্লেখ করতে চাই। সবাই তাকে নেন্দু মেকার হিসেবে চিনে। কিছুদিন আগে তার সঙ্গে কথা হলো । কথার এক পর্যায়ে তিনি তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের কিছু ঘটনা আমাকে শুনালেন। তিনি বললেন- 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি টগবগে এক যুবক। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি যুদ্ধে যাব।' অনেক বাধা অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। হয়তো এমন আরও অনেক সাহসী ও গুণী মানুষ জন্ম নিয়েছেন এই কাকিনায় - যাদের কথা আমাদের অজানাই থেকে যাবে। একটি কবিতায় কিছু অংশ বলে জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

তোমাতে আমার পিতা-মাতামহোগণ
জন্মেছিল একদিন আমারি মতন
তোমারি এ বায়ু তাপে তাহাদের দেহ
পুষেছিলে পুষিতেছ আমায় যেমন
জন্মভূমি জননী আমার যেথা তুমি
তাহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃভূমি
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহোগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীব লীলা শেষে।
তাদের শোণিত অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

সাক্ষাৎকারমূলক এ নিবন্ধটি সংগ্রহ করেছেন মোছা: আখলেছা বেগম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কাকিনা

নেন্দু শেখ

আজ থেকে প্রায় ১০৫ বছর আগে আমার জন্ম কাকিনার এক দরিদ্র পরিবারে। জন্মের পর থেকেই আজ অবধি দারিদ্রের মাঝে দিনাতিপাত করছি। এজন্য লেখাপড়া শেখার সুযোগ আমার হয়নি। ২০/২১ বছর বয়সে রংপুর শহরে পাড়ি জমাই। সেখানে গাড়ীর হেলপারীর সঙ্গে গাড়ী মেরামতের কাজ এবং এক আধটু ড্রাইভারিও রপ্ত করি। এভাবে বছর দশেক পর আবার নিজ গ্রাম কাকিনায় চলে আসি।

কাকিনায় এসে অবিনাশ কান্তি ঘোষের বাড়ীতে আসা যাওয়ার এক পর্যায়ে তার সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠে। তার কিছু প্রজা সে সময় বান্দের কুড়া, গোড়াল ও চলবলা এলাকায় ছিল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সে সব জায়গায় যেতাম। তার নির্দেশে প্রজাদের কাছ থেকে কখনও কখনও ফসলের অংশ ও টাকা পয়সা নিয়ে এনে তাকে দিতাম। এভাবে ২/৩ বছর কেটে যায়। আমার বয়স তখন ৩০/৩২ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু গেছে। যুদ্ধে যাবার নেশা পেয়ে বসল আমাকে। কিন্তু কোথায় যাবো, কিভাবে যাবো কোন কিছুই আমার জানা ছিল না। শেষে মাথায় এক খেয়াল চাপলো। অবিনাশ বাবুর প্রজাদের কাছ থেকে কিছু টাকা তুলে যুদ্ধের সৈনিক হওয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম ঢাকার উদ্দেশ্যে।

এরপর লালমনির হাট-রংপুর হয়ে ঢাকায় গিয়ে হাজির হলাম। ঢাকা আসার পথে ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ বিমান উড়তে দেখেছি। বিমানের বিকট শব্দে আমি আঁৎকে উঠি। এভাবে ভয়ে ভয়ে কিভাবে যে ঢাকা পৌঁছলাম তা নিজেও বলতে পারব না। অজানা-অচেনা ঢাকা। কোন কুল কিনারা খুঁজে পাইনা। এভাবে একদিন বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে হাজির হলাম। তারিখটা মনে নেই।

ভীষণ ভয় নিয়ে ক্যাম্পের কমান্ডারের সামনে হাজির হয়ে তার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানালাম। এর কিছুক্ষণ পর আমার স্থাস্থ্য ও আরো কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হল। শেষে আমার গাড়ী চালানো ও মেরামতের বিদ্যাটুকুর জোরে আমার মনের আশা পূর্ণ হলো।

সেখান থেকে আমাকে পাঠানো হলো বর্তমান পাকিস্তানের পিন্ডিতে অবস্থিত হাসেন আব্দেল সেনা ক্যাম্পে। কোম্পানীর নাম এপিসি-১৪০৩, পূর্ব রণাঙ্গন। কোম্পানী কমান্ডর হিসেবে প্রথমে ছিলেন ক্যাপ্টন বেটাসবি ও পরে ক্যাপ্টন জেমস। সুবাদার ছিলেন পাঞ্জাবের বছির হোসেন শাহ ও গুজরাটের শেরীফ খান। মেজর সালেহ মোহাম্মদ খান ছিলেন আমার কোম্পানী হাবিলদার। কোম্পানীতে আমার পদবী ছিল ল্যান্স নায়েক (ড্রাইভার)। আমার অধীনে ৮ জন ড্রাইভার ছিলেন। তাদের মধ্যে ঢাকার আবদুল গণি, কুমিল্লার আবদুল আলীম ও সিরাজুল হক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব আলী, মোজাফফর হোসেন ও আবদুল আজিজের নাম মনে পড়ছে।

আমার পরিচিতি নম্বর ছিল- ৩৬১২৬৮। আমাকে যুদ্ধ পরিচালনার উপর ৩ মাস বিশেষ ট্রেনিং প্রদান প্রদান করা হয়। এরপর সেখান থেকে আমাদেরকে শ্রীলংকার কলম্বোর এডুয়াটাল ব্যাটেল ফিল্ডে পাঠানো হয়। সেখানে আমার দায়িত্ব ছিল ক্যাম্প থেকে সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে আনা-নেওয়া করা। তবে বিশুদ্ধ পানীর জলের ব্যবস্থা করাও আমার বাড়তি দায়িত্বের মধ্যে ছিল। কারণ এডুয়াটাল এলাকা সমুদ্রের পাড়ে হওয়ায় সেখানকার লোনা পানি পানের উপযোগী ছিল না। কলম্বো থেকে ৭ মাস পর কোম্পানী চলে আসে বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার)। সেখানে ঘাটি বসানো হয় রেসকোর্স ময়দানে। বার্মায় পাহাড়-পর্বত ও খানা খন্দক বেশী থাকায় পাহাড়ী পথে গাড়ী চালাতে আমার খুব কষ্ট হত। এই দুর্গম পথে একদিন গাড়ী উল্টে পায়ে প্রচন্ড আঘাত পাই। সে আঘাতের চিহ্ন এখনও আমার ডান পায়ের উরুতে বিদ্যমান। আমরা বার্মাতে ৭ মাস ছিলাম। এরপর আসি আসামের মনিপুর ও কোহিমাতে। সেখানে একদিন ইম্ফলে বিপক্ষ সৈন্যরা প্রচন্ড আক্রমণ চালায় আমাদের উপর। ৪/৫ ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এক সময় বিপক্ষ দলের দুটি বিমান ভুপাতিত হলে যুদ্ধের তীব্রতা কমেতে যায় । আমি ৩ বছর ৮ মাস বৃটিশদের হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর যুদ্ধের দামামা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদেরকে ভারতের পুনায় একত্রিত করা হয়। সেখানে একদিন এক বৃটিশ কমান্ডার আমার হাতে কিছু টাকা, তিনটি

মেডেল (একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ), একটি ওয়ারসি (সনদ) এবং সঙ্গে ট্রেনের পাস (টিকেট) দিয়ে বিদায় জানান। আমি সেখান থেকে লালমনির হাট হয়ে সোজা আমার নিবাস কাকিনায় চলে আসি। যুদ্ধে থাকাকালে আমার বাড়ীর ঠিকানায় বাবাকে প্রতিমাসে ৬০ টাকা করে পাঠানো হত বলে পরে আমি জেনেছি।
যে সময়ের কথা বলছি তখন কাকিনা ছিল শহরের মত। আমি কাকিনার রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরীকে দেখেছি। রাজার দু'টি হাওয়াখানা দেখেছি। এর একটি ছিল বর্তমান মৎস্যজীবী রমজান আলীর বাড়ীর পশ্চিমে, (বর্তমান কান্দুরা শেখের বাড়ী)। অন্যটি ছিল এর থেকে কিছু দক্ষিণে সে সময়কার ঈদগাহ মাঠের কাছে।
রাজাবাড়ীর সম্মুখ থেকে বাজারের পূর্ব পর্যন্ত পাকা সড়কের দুই পাশে মোমের ঝাড়বাতি ছিল। সন্ধ্যা হলেই রাজ কর্মচারীরা এসব বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। রাজবাড়ীর আশে-পাশে বড় বড় রাজ কর্মচারীদের বাড়ী ছিল।

প্রসঙ্গতঃ
কাকিনা থেকে নেন্দু শেখের আগে আপর শেখ ২য় বিশ্ব যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধে জাপান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তার বড় ছেলে আলহাজ মোঃ সৈয়দ আলা জানান, যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতি মাসে ডাক পিয়ন এসে তাদের বাড়ীতে ৬০ টাকা করে দিয়ে যেত। তিনি ২টি মেডেল ও একটি সনদ পেয়েছিলেন। আপর শেখ ১৯৬৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

নিবন্ধটি তৈরী করেছেন শহীদুর রহমান

বাদুর বাবু

আবদূল হাই

বাদুর বাবু। এক রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত যারা কাকিনায় বসবাস এবং যাতায়াত করেছেন, তারা প্রত্যেকেই এই রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের মানুষটিকে দেখেছেন।

এই মানুষটি দেখতে ছিলেন শ্যামলা । মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল। তিনি সর্বদা বিবস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কয়েক কদম হেঁটেই একটু থামতেন এবং চক্রাকারে ঘুরতেন এবং বিড় বিড় করে কিছু বলতেন, তন্মধ্যে একটি বাক্য শোনা যেত তা হলো 'ধুশ শালা'।

তার হাত দুইটি সব সময় মুষ্টিবদ্ধ থাকত। বাজারের দোকানদারেরা শীতকালে অনেকে তাকে চাদর দিত কিন্তু তা তিনি নিতেন, কেবল চট দিলে তা কাঁধে জড়িয়ে রাখতেন। তার পরিচয় ও জন্ম বৃত্তান্ত কাকিনাবাসীর কাছে রহস্যাবৃত ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি কাকিনা রানীমাতার বোনের ছেলে, আবার কেউ বলেন তিনি মহারাজার ভাগিনা। কথিত আছে তিনি নাকি কি এক গবেষণা করতে গিয়ে এরূপ হয়ে যান।

তার বংশ পরিচয় ও জন্ম বৃত্তান্ত যতই রহস্যময় হোক না কেন, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের একজন সাধক পুরুষ ছিলেন বলে সকলের ধারণা। তিনি ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ালেও সে সময় কাকিনার কোন লোক তাকে কোন বিরক্ত করত না বরং সকলেই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। যে কোন বিপদে তার একটু আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য নারী পুরুষ সকলেই তার কাছে যেত আশীর্বাদের জন্য।

তিনি যার মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করতেন তার মনোস্কামনা পূর্ণ হতো বলে জানা যায়। কিন্তু তিনি সকলকেই আশীর্বাদ করতেন না। অনেকে তাকে টাকা পয়সা দিতে চাইলেও তিনি সকলের পয়সা নিতেন না। যার পয়সা গ্রহণ করতেন এবং আশীর্বাদ করতেন তিনি সফল হতেন বলে বিশ্বাস করা হতো। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় তাকে ২/৪ আনা পয়সা দিয়ে বলতো বাবু আশীর্বাদ করেন যেন পরীক্ষায় পাস করি। কিছুক্ষণ থেমে যদি বলছেন যা, তাহলে সে ছাত্রটি পাস করত। কিন্তু তার কাছে যারা আর্শীবাদ চাইতে আসতেন তাদের সকলকে তিনি আশীর্বাদ করতেন না। দেখা গেলো হঠাৎ কোন বাড়িতে গিয়ে তিনি খাবার চাইতেন। কিন্তু এ ঘটনা সব সময়ের নয়। মাঝে মাঝে কোন কোন দোকানে গিয়ে একটু আটা ও একটু গুড় চেয়ে নিয়ে খোতেন।

তিনি শম্ভু সাগরে সাঁতার কাটতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা- অতি ধীর গতিতে। সাঁতারের সময় তাকে দেখলে মনে হতো তিনি যেন পানির ওপর ভেসে আছেন।

বাদুর বাবুর তিরোধান কিভাবে এবং কখন হলো তা কেউই বলতে পারে না। অনেক পাগল দেখেছি কিন্তু এরূপ একজন অতি ভদ্র পাগল আর চোখে পড়ে নাই।

স্মৃতিময় কাকিনা

মোঃ মুজিবুর রহমান
ব্যাচ- ১৯৬৭

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলাগুলোর মধ্যে লালমনিরহাট অন্যতম। এ জেলারই অন্তর্গত হাতিবান্ধা উপজেলার ডাউয়াবাড়ি ইউনিয়নের উত্তর বিছনদই নামের একটি গ্রামে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার জন্ম। বাড়ির কাছে কোন স্কুল না থাকায় সেই ছোটবেলায় ২ কিলোমিটার দূরের সাতনালা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে রোজ পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি পেরুনোর পর ৩ কিলোমিটার দূরের পারুলিয়া তফসিলী জুনিয়র হাইস্কুলে (বর্তমান হাইস্কুল) ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করি। সাতনালা ও পারুলিয়া দু'টি স্কুলেই তিস্তা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। ফলে তিস্তার গতিবিধি, রূপযৌবন, বন্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ছোট বেলা থেকেই আমার সম্যক ধারণা ছিল। শরৎকালে প্রস্ফূটিত কাশবনের শ্বেত শুভ্র ফুল আমার হৃদয় -মনকে সবচেয়ে বেশি বিমোহিত করত। জুনিয়র শেষে এই তিস্তা পাড়ের ঐতিহ্যমন্ডিত কাকিনা মহিমা রঞ্জন মেমোরিয়াল হাইস্কুলে ভর্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেই।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্কুলে ভর্তির পূর্ব দিন সন্ধ্যায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চাপারতলের মরহুম আফসার উদ্দিনের সঙ্গে স্কুলের তৎকালীন সভাপতি জনাব ইয়াসীন আলী হাসান ওরফে পুটু মিয়ার বাড়িতে (যা বর্তমানে কবি বাড়ি নামে সমধিক পরিচিত) সাক্ষাত করতে যাই। সভাপতি সাহেবের পরিপাটি বৈঠকখানা এবং কেতাদুরস্ত পোশাকাদি দেখে আমি বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যাই। সালাম বিনিময়ের পর উনি আমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, Have you promoted from class eight to class nine, আমি খুব ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম Yes Sir- আমার উত্তরে উনি খুব খুশি হয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তারপর থেকে যেখানেই, যে অবস্থায়ই দেখা হোক না কেন ওনার সঙ্গে ইংরেজিতে দু'চার মিনিট কথাবার্তা হতো। জনাব পুটু মিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজটি একনজর দেখার জন্য মনের মধ্যে তীব্র বায়নার সৃষ্টি হয়। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মনের সেই বাসনা পূর্ণ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের নামানুসারে কলিকাতার ওই স্থানটি বর্তমানে কলেজ স্ট্রিট নামে সুপরিচিত।

কাকিনা স্কুলে ভর্তি হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হলো যে, স্কুলের সেই সময়কার প্রধান শিক্ষক জনাব আমিনুর রহমান সাহেবের সাথে আমার আব্বা মরহুম এনায়েত উল্লাহর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমিনুর স্যার আমাদের এলাকার একজন সুশিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।

এ ছাড়া ছোটবেলা থেকে আমার আব্বা কাকিনা রাজবাড়ির শান শওকত, রূপ জৌলুস, স্কুলের অবস্থান, পরিবেশ, মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই স্কুলে আমাকে পড়ানো তার মনের মধ্যে একটা সুপ্ত

বাসনাও ছিল। ফলে সবকিছুর মিলিত প্রয়াসে আমি কাকিনা হাইস্কুলে ভর্তি হই। ভর্তির কয়েক মাস পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ওই যুদ্ধের সময় বুড়িমারী সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার ভারতীয় মুসলমান পরিবার পরিজন নিয়ে এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় ট্রেনে করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। ভারতে এদেরকে quit India বা ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

আমিনুর রহমান স্যারের নির্দেশে উদ্বাস্তুদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য আমরা তখন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করি। এজন্য বিভিন্ন গ্রাম ও হাট বাজারে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছাড়াও অতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও অর্থিক সহায়তা পেয়েছি।

স্মৃতিতে আরো একটি ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে আছে- তা হলো ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ইন্টারস্কুল স্পোর্টস-এ হারাগাছের দরদী হাইস্কুল এবং কাকিনা হাইস্কুলের ফুটবল খেলাটির কথা। খেলাটি কাউনিয়া হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ওই খেলাতে আমজাদ, মফিদার, ক্ষিতিশ, শিশির, হালিম, নজরুল, পনির, শামসুল, জামি, শহিদারসহ আমাদের টিমের সকল খেলোয়াড়ের অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্যে দরদী স্কুল প্রায় পরাজিত হওয়ার পথে, ঠিক সেই মুহূর্তে হারাগাছের দর্শকরা খেলাটি পন্ড করার জন্য মারমুখী হয়ে মাঠে প্রবেশ করে আমাদের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মারধর শুরু করে দেয়।

ঠিক এ সময় কাউনিয়ার অগণিত সাধারণ দর্শক ক্ষিপ্ত হয়ে হারাগাছের খেলোয়াড়সহ তাদের সমর্থকদের ভূতছাড়া রেল স্টেশনের দিকে হটিয়ে দেয় (বর্তমান মীরবাগ)। পরে কাউনিয়ার লোকজনদের সহায়তায় আমরা সেখান থেকে রাতের ট্রেনে সদলবলে কাকিনায় পৌছি। আজ ৪৩ বছর পরও সেদিনের এ ঘটনাটি স্মৃতিতে ভাস্বও হয়ে আছে।

কাকিনা হাইস্কুলের অনতিদূরে পশ্চিম এবং দক্ষিণে প্রমত্তা তিস্তা। প্রচন্ড্র গরমের সময়ও তিস্তা পাড়ের দখিনা হাওয়া মনকে সতেজ করে তুলতো। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস হতে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল, এই ২৮ মাস কাকিনায় অবস্থানের প্রতি মুহূর্তের স্মৃতি আজো থরে থরে সাজানো রয়েছে মনের মণিকোঠায়।

লেখক-উপ-পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ ব্যাংক, হেড অফিস
ঢাকা।

কিছু স্মৃতি

মোঃ আজহার হোসেন

অনেক কথা মনে ভাসছে। কিন্তু কোন কিছুরই সবটা গুছাতে পারছি না। তবে, এ মূহুর্তে বেশ মনে পড়ছে যে কাকিনার প্রথম মসজিদ শম্ভু সাগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। একটি টিনের ঘর। বেড়া ছিল টিন ও ধারা (বাঁশের তৈরী চাটাই) দিয়ে তৈরী। এ মসজিদে রাজার অনুদান ছিল মাসে ৫ টাকা। এখানকার ইমাম ছিলেন মৌলভী দিদার মুহাম্মদ। দিদার মুহাম্মদের তিন ছেলে আজগার হোসেন, আকতার হোসেন ও ছোট ছেলে আমি (আজহার হোসেন)। বাবা খারিজী লাইনে লেখাপড়া করেছেন। বাবার শিক্ষক ছিলেন আবদুল লতিফ মাওলানা। তিনি কাকিনা রাজার আরবী ও ফার্সী শিক্ষক ছিলেন।

পরবর্তীতে এই মসজিদ নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়। এরপর রাজার অনুদান আসে তেলিটারীর মসজিদে। পরে এই অনুদান ইদ্রিস মিয়ার উদ্যোগে কাকিনা বাজার মসজিদে স্থানান্তর হয়।

সে সময় মুসলমানী বা খাৎনায় প্রচুর ধূমধাম হতো। খাৎনার অনুষ্ঠানকে বলা হতো বেশরদার অনুষ্ঠান। আমার বাবা দিদার মুহাম্মদ ও তার বড় ভাই অর্থাৎ আমার জ্যাঠা আবদুল করিমের খাৎনা উপলক্ষে সাত দিন অনুষ্ঠান হয়েছিল শুনেছি। আমি ১৯৩৫ সালে নামুড়ীতে ছানার মাদ্রাসায় ক্লাশ থ্রীতে ভর্তি হই। সে হিসেবে আমার জন্ম মোটামুটিভাবে ১৯২৫সাল।

রাজবাড়ীর অনেক কথাই মনে পড়ে। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান কলেজের গেটের স্থানেই ছিল রাজবাড়ীর প্রধান ফটক। গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে উত্তরে ছিল প্যালেস। পশ্চিমে আয়রন বাংলা। তিন তলা এই ভবনটি লোহার বীম দিয়ে তৈরী ছিল। এক তলা পর্যন্ত ইটের গাঁথুনি। ২য় ও ৩য় তলা মোটা কাশের (মুজা বা সরঞ্জা) বেড়ার উপর সুরকীর পলেস্তার দিয়ে গাঁথা।

নিচ তলায় বসার জায়গা ছিল। নিচ তলা ও দ্বিতীয় তলা দেখতে গুহার মত ছিল। তৃতীয় তলায় থাকার ব্যবস্থাও ছিল। এখানে শোয়ার খাট দেখেছি। এছাড়া রাজবাড়ীতে আরো দোতলা ও একতলা ভবল এবং একটি গুহা ভবনও (আন্ধা কুঠি) দেখেছি।

শম্ভু সাগর

শম্ভু সাগর সম্পর্কে শুনেছি, পুকুর খননের পরও এতে পানি উঠে না। এরপর বন বিভাগ থেকে বড় বড় শাল গাছ আনা হয়। শ্রমিকরা এই শাল গাছ পুকুরের মাঝখানে দাবাতে থাকে। এরফলে এক সময় তীব্র বেগে পানি উঠতে শুরু করলে শ্রমিকরা ছুটোছুটি করে পাড়ে উঠার সময় কয়েকজন পানিতে ডুবে মারা যায় বলে শুনেছি । এভাবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পুকুর পানিতে ভরে উঠে। আমি নিজেও শম্ভু সাগরের চার কোণায় চারটি শালগাছ দাবানো অবস্থায় দেখেছি।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহে সহায়তা করেছেন গোলাম মো: হাছান

রংপুর শহরে কাকিনা হাউস

আইনজীবী মোঃ জগলুল তার বাসায় আলাপ- ১০এপ্রিল ২০০৮ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। এ সময় অখিলেশ্বর বর্মন(অখিল দা) ছিলেন।

তার দেয়া তথ্যানুযায়ী রংপুর শহরের বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডিসি অফিস পর্যনত কাকিনা হাউস এলাকা ছিল। এখানে মোট জমির পরিমাণ ছিল ৯একর ৫২শতক। এর মধ্যে কাকিনা হাউস চত্তরে অবসথিত পুকুরটির পরিমাণ ছিল ১একর ৮৪শতক। যার দাগ নং-৩০৯। বর্তমান ডিসির বাংলো যার দাগ ৩১৫, জমির পরিমাণ ৫একর ২১শতক। ৩০৫/৫২৩ দাগে জমির পরিমাণ হচ্ছে ৪২শতক। ৩১৬/ ৫২০দাগে জমির পরিমাণ৯শতক। ৩১৬দাগে জমি ১একর ৭৩শতক। এই জমির জোত হচ্ছে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী, মৌজা-রঘুনাথ গঞ্জ- উলিপুরের জমিদার সুষমাময়ী নন্দীর কাছ থেকে চিরস্থায়ী মোকরারী। ক্রেতা-মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী পিতা-মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী পোঃ ও গ্রাম- কাকিনা।

জগলুল সাহেব জানান, তিনি ১৯৪৪-৪৫সালে কাকিনা হাউস দেখেছেন। সেখানে একটি বড় পুকুর ছিল।এক তলাপাকা বিল্ডিং ছিল একটি। ৫-৬টি রুম ছিল। সার্ভেন্ট কোয়াটারও দেখেছি। সুন্দর একটি বাগানও ছিল। এই রাজ কুঠির এক দারোয়ানের ছেলের নাম ছিল রাজা রাম। সে জিলা স্কুলে আমার সঙ্গে ক্লাশ থ্রীতে পড়তো। ১৯৫০সালে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে এই সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। সে সময় ডেপুটি ম্যাজিস্টেট এই রাজ কুঠির ৮বিঘা জমি সম্ভবত ৮হাজার টাকায় কিনে নেয়।

সদর হাসাতালে সার্জিক্যাল বিল্ডিং কাকিনা রাজাসহ কয়েকজনের অনুদানে তৈরী

ছড়ায় ছড়ায় স্মৃতি কথা

বিনতা রায় দেব অধিকারী

মেয়েরা হল মায়ের জাত
নয়কো মোটে পণ্য
বিজ্ঞানের জগতে আজ
সমানাধিকারে গণ্য।
দিতে হবে পুষ্টি আলো
আমার বাবার ভাবনা,
খেলার পুতুল শিখায় তুলে
পাঠান মোরে কাকিনা।
মহিমারঞ্জন হাই স্কুল
হেড মাষ্টার স্বয়ং দাদু
স্নেহরসে ডুবিয়ে বলার
জানেন কথার যাদু।
কতই বা বয়স আমার
বছর আট/নয়
মুখ শুকলে হয়তো বা
দুধের গন্ধ বেরয়।
বড়র কথা শুনে চলাই
সেই সময়ের ধর্ম
থোরাই বুঝি জীবন টীবন
পড়াশুনার মর্ম।
পথের লোকে চেনায় চলা
বলা শেখায় প্রকৃতি
কাকুই স্টেজে প্রথম উঠায়
'খুকুর বালিশ' আবৃত্তি।
'শম্ভু সাগর' সাঁতার শেখায়
বাজারে গিয়ে হিসাব

প্রতাপবাবু শিখান ইংরেজী
আর হামিদ মিঞা কিতাব।
ম্যাপের গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে
দাদুর ভূগোল শিখি
অঙ্কনে কেউ গোল্লা পেলে
হাসি চেপে রাখি।
একটি রুমে কোরান ক্লাশ আর
শিশির বাবুর গল্প....
সে মহাভারত তোলা থাক
পরিসর অল্প।
ব্রাহ্মসমাজ' 'হাসপাতাল'
গিয়ে জানি কেমন
এমনি করে চলায় বলায়
বাড়ে জ্ঞানের অঙ্গন।
'বকুলগাছটা স্কুলের
জানে নানা ছল
পাতা নেড়ে ডাকে মোদের
কুড়িয়ে খেতাম ফল।
কচি মন দোল খায় আর
দোলায় সবুজ ধান
ছানা বড়া চোখে ঢোকে
তিস্তা নদীর বান।
ঠাকমা ঘরে সুক্তা রাঁধে
সেও লাগে মিষ্টি
তিক্ত কস উধাও দূরে
পাকা হাতের সৃষ্টি।
পুকুর পাড়ের তালের বড়া
মেজদি পিশি গড়ে
চাউনিতে মন ভিজে যায়
মুখে দিলেই পেট ভরে।
দেখে খেয়ে টুকিটাকিজ....
আমিও যেতাম শিখে
রেখে দিতাম সযতনে
মনের পাতায় লিখে।
ভোরের শিউলি সিক্ত ঘাসে
নিত্যি পড়ে ঝরে
সাজি ভরে তুলে নিয়ে
রাখি পূজোর ঘরে।
লোহার পুল 'বেনিয়ান ট্রি'
মুক্তা 'চোর্তা গাছে'র
তাক লাগানো মোহনরূপ
জানি না কোন কাজের।
গড়ের খালে'র বালির স্তরে
গিমা ঢেকির বন
সুরকি পথের কালো হাওয়া

গা ছম ছম ছম।
একে একে কেমন করে
সময় গেল চলে
কাকিনার চারটি বছর
ভেসে গেল কালে।
কানে এল অচিন আওয়াজ
খুলি বন্ধ তালা
পদে পদে সেই গন্ধ ঘোরে
খুঁজি ছবির মালা।
যথারীতি পথের গতি
বেড়ে বেড়ে যায়
অনেক চড়াই ডিঙাই....
উঠি, নূতন আঙ্গিনায়
যে আঙ্গিনায়, জুতো সেলাই আর চন্ডীপাঠে
জীবন-তরী ছোটে
খুন্তি কড়াই গরম তেলে
হাজার কথা ফোটে।....
সোনার অতীত গোপন খাঁচায়
স্মৃতি রেখে যায়,.....
বর্তমানে কাঁদি হাসি,
ভবিষ্যত বাঁধায়।
ছোট বেলার ছবি ....,, কথা.....,
আজও 'স্মৃতি জাগে
সুখের তারে বোনা ও যে
দারুণ ভাল লাগে।

১। আমার বাবা– শ্রী হরি শঙ্কর রায়
২। হেড মাষ্টার- শ্রী গিরিজা শঙ্কর গুপ্ত (আমার দাদু ডাকতাম)
৩। কাকু - দাদুর ছেলে- শ্রী অমিয় শঙ্কর গুপ্ত
৪। খুকুর বালিশ– কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা
৫। ঠাকমা– কাকুর মা- আমরা ঠাকমা ডাকতাম।
৬। মেজদি -ঠাকমার নাতনি
৭। পিশি – ২ জন ছিলেন পুটু পিশি ও মনু পিশি।
পুটু পিশি চাকুরীসূত্রে কলকাতায় ছিলেন। মনুপিশি গার্লস স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস ছিলেন।
এছাড়া ছিলো ভজন– ও আমার সহপাঠির ছিল।

মৃদু মন্দ (নাকি মন্দ মন্দ) ধীরে বহিছে অনিল

প্রভাত সমীরে কুসুম ফুটিল"
বকুল ফুল কুড়ানো

লরেলের ডালে বসে মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা-পশ্চিমে দীঘিতে শ্বেতশুভ্র আর পূবের দীঘিতে অপূর্ব গোলাপী রংয়ের পদ্মঘেরা বটপাকুড়ের ছায়াতলে সবুজ ঘাসের পরে বসে থাকা– সেসব মধুময়, স্মৃতিময় ক্ষণগুলো চিরদিন মনের (আর্কাইভে) সংগ্রহশালায় আছে। আরো আছে নাট্যমঞ্চে দেখা অভিনয় করা, গান শোনা, নাচ দেখার স্বপ্নিল স্মৃতি।
আসলে আমার মনের আর মাথার ক্যাসেটে এ সংগীত এ ছবি শুধু আমার মন যেমন করে দেখে এসেছে তা শুধু একান্তভাবে আমারি- তার প্রকাশ কথায়-লেখায় জানানো খুব একটা সম্ভব না। কারণ আমার এই লেখার যোগ্যতা বা অভ্যেস নেই।
জীবনের পথ এ গাঁয়ের এক গৃহকোণে জন্ম নেবার পর থেকে বহুদূর অনেক পথে ঘাটে মাঠে প্রান্তরে পাহাড়ে-পর্বতে সাগর জলপ্রপাতের তীরে পৃথিবীর অনেক অনেক স্থানে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও আমার-আমাদের কাকিনা এ জন্মভূমি সদাজাগ্রত প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মনে পড়ে।
মানুষ এসেছিল, আসছে, আসবে-এ গাঁয়ের প্রায় পাঁচশো বছরের গাঁথা আমার জানা হয়েছে। তারও আগে এ জনপদ ছিলো।
আজ আমরা এ বিদ্যালয়ের ১৫০ বছর উদযাপনের আনন্দ-উৎসবে মিলেছি–মেলে যেনো যুগ যুগান্ত ধরে, সুখে-শান্তিতে, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে, আনন্দে শিক্ষায় ধ্যানে, গুণে, জ্ঞানে, ধর্মে, কর্মে পৃথিবীর এ অংশের এ গাঁয়ের মানুষ অনন্ত কাল ধরে।

সবার জন্য শুভ কামনা রেখে তোমাদেরই একজন আমি।

হামিদুল হক মৃধা
জার্মানী
২০০৯ , বন-বার্লিন

স্মৃতির মধুরতা

তাহমিনা হক নার্গিস

কাকিনা স্কুলের সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল আমার ঠিক জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই। আমার বড় বোন, সম্ভবত আমার বয়স তখন পাঁচ বছর, আমাকে প্রায়ই সাথে করে নিয়ে যেতেন স্কুলে। বলা যায় সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল আমার কাকিনা স্কুলের মঞ্চের সাথেও সম্পর্ক। শাড়ীতে ফিতা বেঁধে কোমড়ে জড়িয়ে, সাজিয়ে তুলে দেয়া হতো আলো ঝলমল মঞ্চে। বিরাট মনে হত তখন সেই স্টেজ-কি ঘুরে ঘুরে মনের আনন্দেই না নাচতাম! মনে পড়ে সেই গান "নীলও শাড়ী দোলে দোলে ময়ূর পাখা ললিতা সনে" আর তালে তালে ছোট বেলার সেই নৃত্য। তারপর অনেক নাচ, গান, কৌতুক এবং সবশেষে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঝর্ণার তরঙ্গের দোলা ফুটিয়ে তুলে শেষ করেছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে আগে সেই মঞ্চের সাথে সম্পর্ক। শেষ হয়েছিল আমার স্কুল জীবন। সেটা ছিল ১৯৬৭ সাল।

আজ অর্ধ শতাব্দি পরেও মনে পড়ে স্কুলের সেই উৎসব মূখর দিনগুলোর কথা। প্রতি বছরই একবার বা দু'বার কত রকমের খেলাধুলা হত সারাদিন। আমি কিন্তু কোনদিন খেলাধুলার জন্য কোন পুরস্কারই পাইনি। পরীক্ষায় যদিও প্রথম বা দ্বিতীয় পুরস্কারটি (অংকে খুব খারাপ থাকা সত্ত্বেও) প্রতি বছরই পেতাম। স্কুলের পিছন দিকে একটা বিরাট খেলার মাঠ ছিল। মনে পড়ে মাথায় হাড়ি নিয়ে দৌড়ের প্রতিযোগীতার কথা। ঠিক যখন লক্ষ্যে পৌঁছে যাব তখনই টুপ করে পড়ে হাড়িটি ভেঙ্গে যেত প্রতিবার একইভাবে।

মনে পড়ে মেয়েদের একটি কমন রুম (Common Room) ছিল এবং সেখানে থেকে সরাসরি যোগাযোগ ছিল তখনকার স্কুল লাইব্রেরীর, যা ছিল আমার জন্য অতি আকর্ষণীয়। কাউকে না বলেই একটি একটি করে বই এনে পড়তাম এবং শেষ হলে সবার অলক্ষ্যেই ঠিক জায়গায় রেখে দিতাম। আমার পড়ার উপযোগী সব বই এবং কিছু কিছু অনুপযোগী বইও পড়ে ফেলেছিলাম। মনে পড়ে সেই বকুল গাছটির কথা, শত বছরের স্বাক্ষী হয়ে সে আজও দাঁড়িয়ে আছে। তখন এত বকুল ফুল আর কোথাও দেখিনি। হাত ভরে কুড়াতাম সেই ফুল।

আজ পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে উপলব্ধি করতে পারি কত প্রগতিশীল এবং অনেকাংশে সংস্কারবিহীন পরিবেশ দিতে পেরেছিল আমাদের এই স্কুল। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় আমার বাবা মরহুম আব্দুল হামিদের কথা। যিনি কাকিনা স্কুলের উন্নয়নের কথা দিনরাত ভাবতেন। কতবার দেখেছি দারুন আগ্রহ নিয়ে অনেক ঘটা করে যেতেন রংপুরে স্কুল সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে তখনকার দিনে কাকিনা থেকে রংপুর ভ্রমণ ছিল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়গুলো তখন খুএকটা বুঝতাম না। শুধু একটু বুঝেছি যে তিনি স্কুলের ভালো চাইতেন মন প্রাণ দিয়ে এবং তার জন্য কাজ করে যেতেন নিঃস্বার্থভাবে। শ্রদ্ধা জানাই আমার বড় ভাই জনাব আব্দুস সালামকে। যিনি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ফিরে এসেছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। শ্রদ্ধা জানাই আমার শিক্ষকগণকে।

জার্মানীতে মিশরীয় শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরে চাকরীর সূত্রধরে এ বছরেই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তির উৎসবে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। এই উৎসবে যোগ দিয়ে গর্ববোধ হয়েছে আমার ফেলে আসা স্কুলটির কথা ভেবে। মনে হয়েছে সেই বা কম কিসে!

আরও মনে হয়েছে কাকিনা, মিশর, জার্মানী-পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্ব বেশী নয়। আমরা যারা ছড়িয়ে পড়েছি সারা পৃথিবীতে, তাদের জন্য স্কুলের স্মৃতি রয়েছে বা থাকবে চিরকাল অম্লান হয়ে।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ড; মোজাম্মেল ভাই এবং অন্যান্য সবাইকে যারা স্কুলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

শুভেচ্ছা জানাই আমার সহপাঠি বন্ধু-বান্ধবীদের। অভিনন্দন জানাই আজকের প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দকে। আর আমার স্কুল যে আমার মাঝে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালবাসার বীজ বুনে দিয়েছিল, তার ১৫০ বছর পূর্তিতে রইল ভালবাসার অর্ঘ।

কাকিনা : ফিরে দেখা (১৯৪৩–২০০৭)

অধ্যাপক আবদুস সালাম

আমি কাকিনার লোক। জন্ম ১৯৩৫, ডিসেম্বর। আজ উপান্তবেলায় (২০০৮) ফিরে দেখা আমার কাকিনাকে। কাকিনা মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল হাই ইংলিশ স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছে এক বালক। সেটা ১৯৪৩ সাল। বরাবর টিচার্স রুমটা ছিল পুরোনো মূল বিল্ডিং এর পূর্বাংশে কিন্তু সেটাই তখন আমাদের ক্লাশ থ্রি। ক্লাশ শিক্ষক প্যারী বাবু বালকের এক সহপাঠি রবি ঘোষকে শাসন করছেন– "দ্যাগ রবি, মার খেয়ে মরে যাবি নে। অন্যদিকে ইংরেজী পড়াতে আসতেন প্রতাতবাবু।

দশাসই চেহারা, ফর্সা টকটকে রং। সে সব কথা ভাবতে ভাবতে টিফিন পিরিয়ডের কথা মনে পড়ে। স্কুলের পূবদীঘির উত্তর পাড়টা ছিল শ্যাওলা আর স্বচ্ছ জলে সুন্দর। লাল-নীল মাছগুলো এসে শ্যাওলার ভিড়ে মুখ লুকাত। সেই রঙিন মাছগুলো ধরাই ছিল আমাদের খেলা। পশ্চিমের ইঁদারার কাছে সেই কামরাঙ্গা গাছ তলায় পানি খেতে যেতাম। মনে পড়ে কিংবদন্তি খ্যাত গ্রীসের 'লরেল' গাছটি ছিল আমাদের স্কুল প্রাঙ্গনের উত্তরে। গোলগাল, ডালপালা ছড়ানো অনতি উচ্চ সুন্দর গাছটি ছিল আমাদের বান্দরলাঠি খেলার জায়গা। লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত গাছটির উপর-ডালে চলে যাওয়া। এক্কেবারে ধরাছোয়ার বাইরে। তারপরে আরো অনেক নিয়ম নিয়ে সে খেলা হত। আর হেডমাষ্টার মশাই এর কক্ষ সংলগ্ন প্রাচীন বকুলের তলায় ঘুরে বেড়ানো। সেই স্কুল আজো আছে। তবে ভগ্নস্বাস্থ্য। বাল্যস্মৃতির ছায়াছবি দীর্ঘ করে লাভ নেই। সময় কখন যে চলে যায়। চলেও গেছে। থ্রি থেকে ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন। কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান। প্রতি বছর রি-ইউনিয়ন উৎসবে সেই সাজসজ্জা আর ফুলের সুবাস স্মৃতিকে আজো আচ্ছন্ন করে।

উন্মনা করে তোলে। রি-ইউনিয়ন– পুরাতন ও নতুন ছাত্রের মিলন-উৎসব। স্কুলের কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ি দিয়ে বড় বড় করে We/Come লেখা, সিন্ধুগৌরব নাটক, অভিনয়, জেদাসের ভৌতিক ম্যাজিক দেখে হতবাক হওয়া– এভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। সরস্বতীপূজা, মিলাদ মাহফিল, ফুটবল টুর্ণামেন্ট, শম্ভুসাগরে সাঁতার প্রতিযোগিতা, ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে গান গাওয়া এই সব নিয়ে সৌন্দর্যময়ী কাকিনায় আমার বালক বেলা কেটেছে। সৌন্দর্যময়ী এজন্য যে কাকিনা আর দশটা গ্রাম থেকে ছিল স্বতন্ত্র। নৈসর্গিক পট ছিল ভিন্ন–বিশেষ করে বিদেশী গাছে, ফুলে, চওড়া সরণীতে গাও গ্রাম কিছুতেই বল যায় না। রাজ প্রাসাদ, প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের নাম না জানা বৃক্ষরাজী, দক্ষিণে স্বচ্ছ তিস্তার প্রবাহ, নকল মাটির সুউচ্চ পাহাড় তার চারদিকে বড় বড় রেইনট্রি গাছের ছায়াঘেরা আবহে একটি আরণ্যক বনভূমি, পাশে ক্ষীণাঙ্গী দীর্ঘ একটি নির্জন খাল, ও দিকে শম্ভু সাগরের দক্ষিণে কালিবাড়ী, উত্তরে ব্রাহ্ম সমাজ ভবনে উৎসবের প্রদীপ জ্বাল রাত, পূর্বে বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিমে বাবু গিরিজাশঙ্কর রায়-এর (স্বনামধন্য হেডমাস্টার) বাসাসহ আরো ২/১ টি বাসা- এই নিয়ে শান্ত সৌম্য, সৌন্দয্যময়ী কাকিনার একাংশ। তিস্তার তীর ছিল কাকিনা বাসীর নিয়মিত মুক্ত হাওয়ায় যাওয়ার প্রেরণা। কালিবাড়ীর ভাঙ্গা পাঁচিলের উপরে বসে, লুকিয়ে, বিকেল বেলা দস্যু মোহন ডিটেকটিভ বই- এর নেশায় পাওয়া কিশোর পড়ুয়াদের খুব মনে পড়ে।

দূরদুরান্তের গ্রাম থেকে দলগ্রাম চলবলা, মহিষখাঁচা, পলাশী চামটা গঙ্গাচড়া, মহীপুর, হারাগাছ আশে পাশে সব জায়গা থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত কাকিনা স্কুলে। এমন কি জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকেও কেউ কেউ কোন সুবাদে পড়তে আসত।

কারণ স্কুলের হেডমাস্টার বাবু গিরিজা শঙ্কর গুপ্ত যিনি আমার ও বাবার হেডমাস্টার। বলা হত উনি তিনপুরুষের হেডমাস্টার। কিংবদন্তীতুল্য এই নিবেদিত প্রাণ মহান শিক্ষক ছিলেন আলোক বর্তিকা। সেই সঙ্গে ছিলেন এক ঝাঁক প্রণম্য শিক্ষক। কাকিনায় আরো কিছু প্রতীকী মানুষ ছিলেন, যারা শিক্ষত, সংস্কৃতিবান, অসাম্প্রদায়িক ও সর্বাংশে মানবিক। আমার সহপাঠিদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিন্দু ছেলে মেয়ে। তখন কি মনে কোন বিভাজনের ছায়া পড়েছিল?

কলকাতা থেকে দূর প্রত্যন্ত কাকিনায় আমরা একটি আদর্শ গ্রামে জীবন শুরু করেছিলাম। এর গাছপালা, পথঘাট, নদী-পুকুর। সকাল-সন্ধ্যা ভালোবেসেছিলাম। তাই বিষণ্নসুরে আপন মনে বলি কোথায় গেল সেই ধুলোয় ভরা স্টেশনে যাওয়ার ডিস্ট্রিক বোর্ডের প্রশস্ত রাস্তা, সেই দীর্ঘ আমবাড়ি ছাওয়া রাস্তা, সেই ঘন জঙ্গলে ঢাকা গা-ছমছমে চাঁপারতল, বিশাল ধোপার দীঘির কোণে পানিয়াল ফলের লোভে যাওয়া কৈশোরকাল, কতকাল জঙ্গলে আছেন বোচার দীঘি, পশ্চিমে যেতে

কুমার পাড়া, ধোপার বাড়ি, পরে আরো দূরে নদী- এটিও কাকিনার শরীর। স্মৃতিতে আঁকা। আরো পুবে যাও- পাবে সর্দার বাড়ি, নাজির বাড়ি, পরিশেষে কবি-বাড়ি- যে নামে ডাকো কাকিনার প্রাণপুরুষ শেখ ফজলুল করিমের বাড়ি। সে কথা পরে। পার হয়ে বড় বাড়ি আরো পূবে রাজবংশীদের পাড়া, বর্মন ছিল ওদের পদবী। ওরা নয় বর্ণকুলীন হিন্দু, ওরা সাদাসিধে পরিশ্রমী কৃষক। হয়তো কোচ বংশোদ্ভুত। জীবনযাপনে, ভাষায় বিশ্বাসে, আকারে আদি বাসীদের গোত্রলগ্ন। এরা কাকিনাকে বৈচিত্র্যদান করেছে। কারণ নানা শ্রেণী, ধর্ম ও সংস্কৃতি একটা সমাজকে বিচিত্রতা দান করে।

তারপরে পূব থেকে দক্ষিণে যাই। যাই মাছুয়া পাড়ায় (জেলে পাড়া) কামার পাড়া, অল্পস্বল্প বাড়ি, তারপরে ফসলের মাঠ এবং আবার সেই আমাদের তিস্তা নদী। বনেদী কাকিনায় প্রান্তিক এই মানুষেরা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে দেখেছিলেন–
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
এতো আমার কাকিনার ছবি। কৈশোর স্মৃতিতে সেকালের কাকিনার কথায় আসলে গ্রাম বাংলা ছায়াছবি মনের পর্দায় এমনি করে বারবার ভেসে উঠে। স্মৃতিকাতর মানুষের চোখ সাদা হয়না। হয় বর্ণ রঙিন। এই নস্টালজিয়া থেকে কোন এক সময় যৌবন অতিক্রান্ত এই আমি, স্মৃতিকাতর হয়ে লিখেছিলাম–
মুছে গেছে শম্ভুসাগরের ঘাট, ব্রাহ্মণসমাজ ভবন
মাটির পাহাড়, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্ষীণাঙ্গী -
-সুন্দরী খাল, বড় বড় রেইনট্রির ছায়ার মায়া, মুছে গেছে সাজানো জনপদ।
ইতিহাস রাখে ঢাকি মুখ, কাকিনা কি কিম্ভূত!
যেন চেনা আর যায় না তাকে
অর্বাচীন সময় তাকে নিয়ে করে উপহাস
আমি থাকি সংগোপনে, মরি মর্মবেদনায়
হে কাকিনা বিদায়।
আজ ভাবি এ কবিতা, এ বেদনা একটা পারসপেকটিভের বা বিশেষ পটভূমির। পটপরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের স্রোতে অতীতের অশ্রুও মিলিয়ে যায়।

সেই সময়ের কাকিনার শিক্ষিত সমাজের পরিচয় একটু বলা দরকার। শুনতাম তখন কাকিনায় মেয়ে গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। অথচ শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পরিবারের সংখ্যা ছিল হাতে-গোনা। মূল কাকিনায় সেনপাড়া, রায়পাড়া, ঘোষপাড়ায় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকেরা প্রচুর বাস করতেন। প্রায়শই এরা ছিলেন চাকুরে বা বুদ্ধিজীবী। জমাজমি নিয়ে একটা স্বচ্ছল শোভন জীবন নিয়ে শান্তিময় কাকিনায় এরা বাস করতেন। আর এনলাইটেড কাকিনার এরা ছিলেন মুখপাত্র। কাকিনা স্কুলে এদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করত। ছোট বেলায় আমাকে দুটো নজরুল গীতি শিখিয়েছিলেন তরলাদি। কৃষ্ণাদি, পুটুদি আরো কত। ওরা ছোটদের, আমাদের আদর করতেন সে কথা ভুলি কি করে, সেই সময় রোজ সন্ধ্যে বেলা গিরিজাবাবুর স্নেহধন্য ছাত্র হামিদের (আমার বাবা আবদুল হামিদ) বাড়িতে আড্ডা বসত। ডা: সুরেন ব্যানার্জি, বাবার বন্ধু ও গিরিজাবাবুর ছাত্র টয়রাবাবু (শ্রী নৃত্যগোবিন্দলাল রায় কাকিনা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক) ও গিরিজা বাবু স্বয়ং গল্পস্বল্প করতে আসতেন। সেই সান্ধ্য আসরের আন্তরিক পরিবেশ ও শান্তিময় জীবন যাপনের ছবি আজো স্মৃতিলগ্ন হয়ে আছে। সাংস্কৃতিক কাকিনার এরকম প্রতীকী মানুষ তখন আরো ছিলেন পূর্বেও বলেছি। সংস্কৃতি চর্চায় কাকিনার ঐতিহাসিক থিয়েটার হলের কথা মনে পড়ে। নারীপুরুষের উপরে-নিচে বসার পৃথক ব্যবস্থাসহ প্রশস্ত নাট্যমঞ্চ। এই থিয়েটার হল নাট্যচর্চার পীঠ কেন্দ্র ছিল। এরপরে খেলাধূলায় গোপাল লাল শিল্ড টুর্নামেন্ট। স্কুলের পেছনে বড় মাঠে টুর্নামেন্ট চলত। বাইরে থেকে দোমোহনী, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারের টিম আসত খেলতে। তাদের থাকবার স্থান হত সদরতরফের সামনের থিয়েটার হলের ভেতরে। প্রশস্ত জায়গা। জার্সিপরা এই প্লেয়াররা মাঠে যাওয়ার আগে হলের সামলে বল লোফলুফি করে ওয়ার্ম আপের কাজ করে নিতেন। সে দৃশ্য আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। তারপরে মাঠের দক্ষিণে রাবার গাছের পাশে বসে খেলার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার। সে যেন এক উৎসব।

আমাদের পরিবারের মানে কবি-বাড়ির একান্নবর্তী যে পরিবার তাদের সঙ্গে কাকিনার সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলার যে ঘনিষ্ঠযোগ, হিন্দু শ্রেণীর সঙ্গে যে একাত্মতা এর পেছনে শিক্ষা ও জীবনযাপনের সমতাকেই বুঝি। Landed

Aristocracy বা ভূস্বামীর আভিজাত্যকে যদি বনেদীপনা বলা যায়, তবে তাকে কেন্দ্র করে যা দেখেছি তাতে সঙ্গীত, শিকার, কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, কাব্যচর্চা, বিলাস ব্যাসনের অনুসঙ্গে কলকাতার ওয়াসেল মোল্লার দোকান (অভিজাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর) আর ফ্যাপোর (দই-মিষ্টির বিখ্যাত দোকান) প্রসঙ্গে অনেকটা রঙ ছিল। পাখি শিকার, বাঘ শিকার, তিস্তার গহীন হোগলা বনে বুনো শূকর শিকার। নদীতে, জলে স্থলে বারমাসে তের প্রোগ্রাম লেগে থাকত। তিস্তার চখা, চা-পাখি, বেলে হাঁস, নীল মাথা হাঁস, সল্লি, জলকবুতর শিকারে কবি শেখ ফজলুল করিম ছাড়া প্রায় সবাই উৎসাহী ছিলেন। এই সরব কোলাহলের মধ্যে নিভৃতে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন কবি শেখ ফজলুল করিম। ভ্রাতা আবদার রহমান বাজিয়েছেন সেতার। পরবর্তীরা পড়াশুনা নিয়ে কলকাতায়।

আমি রাজা রাণীদের দেখিনি। বৃদ্ধা রাজকুমারী একবার নাজির সাহেবকে দেখতে এসেছিলেন। বাল্যে তখন দেখেছি। কাকিনা রাজবংশের ইতিহাস নতুন করে বলব না। তবে জমিদারী মানে ম্যানেজার, নাজির, মহাফেজ, তহশিলদার, জমানবিশ, খাজাঞ্জী, নায়েব, বখশি, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ, সেনবাবু, রায়বাবু কর্মচারীগণ জমিদারীর খাজনা আদায়ের অবকাঠোমোর অংশ ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লৌহ কঠিন শেখলে জমিদার শুদ্ধ সবাই ছিলেন বাঁধা। রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত এই বিশাল কর্মচারী বাহিনী কাজ অনুযায়ী কেউ তালুকদার, কেউ মন্ডল, কেউ চৌধুরী, কেউ পাটোয়ারী। মহাল, তালুক, খাজনা শব্দগুলি সেই আদি কাকিনার অর্থনৈতিক কাঠামোকে এখনো মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় সেই জীবনকে। চাষা ভূষো, কুলীণ, কৌলিন্যকে চিনিয়ে দে। চোগা, চাপকান, ধূতি, ফৌতা, লেংটিকে চিনিয়ে দেয়। তখন কি আর বুঝেছি উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী আর তার উপজাত বিভাজিত সমাজ কি?

জমিদার, সামন্ত, মিঞা, মৌলভী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, বর্মন, রাজবংশী–কিংবা আরো যে খেটে খাওয়া ব-কলম মানুষেরা– যারা ফসল ফলাত, হাড়িকুড়ি বানাত, চুলকাটত, মাছ বেচতো, ডালাকুলা বানাতো, ছুরি কাঁচি তৈরি করত, গায়ে খাটত তাদের কথা কাকিনার ইতিবৃত্তে তাদেও কথা আছে কি? কাকিনাতেও এরা যেমন ছিল, তেমনি বাঙলার প্রতিটি গাঁয়ে মাটির কাছে এই চাষারাই ছিল। কাকিনার মহিমাকে যেমন দেখেছি– এদের দুঃখ দুর্দশা ও তেমনি মনে দাগ কেটে আছে। আভিজাত্য আর সংস্কৃতির উল্টো পিঠে বর্ণহীন এই কাকিনাকে দেখছি। যারা পিলসুজ হয়ে আলো দিত। ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সবাই বরাবর। সবাই সমান– বিভাজনহীন একটিই শ্রেণী। গরীব চাষা তারা।

তবুও ধন-নির্ধনের অসাম্য তখন সামাজিক সম্পর্কে কোন ছায়া ফেলেনি- অশান্তি সৃষ্টি করেনা। হিন্দু-মুসলমান , ভদ্র-গরীব নির্বিশেষে দাদা, চাচা, বাবু, খুড়ায় কুশল বিনিময় চলত। ভদ্রলোক, মিয়া, বাবুদের এবং শিক্ষিত মানুষকে সাধারণ লোক মান্য করত।

১৯৪৬-৪৭ সাল। সে সময় আমার কিশোরমনে (সেভেনের ছাত্র) কাকিনায় সাম্প্রদায়িকতার ছবিটা কি ধরা পড়েছিল? পরিণত বয়সে এখন মনে হয়– বিচ্ছিন্নভাবে কাকিনার হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিচার করে লাভ নেই। সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলমান বিশেষ শ্রেণীদ্বন্ধের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান জনস্বার্থের নামে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প মানষিকতাকে বিষিয়ে দিয়েছিল- যে রায়ট, খুন জখম ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছিল, তার কিছুই স্পর্শ করে নি আমার কাকিনাকে। দেশ বিভাগের মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়ে কাকিনার রায় পাড়া, সেনপাড়া, ঘোষপাড়া বা হিন্দু ভদ্র শ্রেণীর প্রায় সবাই যে বিদায় নিলেন সাতপুরুষের ভিটা ছেড়ে চিরদিনের জন্য তা ছিল বেদনাবহ। আমি হারিয়েছিলাম আমার স্কুলের কত বন্ধুবান্ধব ও কত শুভানুধ্যায়ী।

১৯৫৬–৭১ পর্যন্তও এদের কেউ কেউ আমাদের শুভাশুভের সঙ্গে পত্র মারফত যুক্ত ছিলেন। কাকিনাকে যে সব পরিবার দেশ বিভাগের সময় গেছে তাদের স্মৃতিকাতরতা পরবর্তীকালে নানাভাবে জেনেছি, দেখেছিও বটে। অথচ আমি যখন ৬ষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে ১৯৪৬–১৯৪৭ সালে হিন্দু ছাত্রবন্ধুরা রাজনীতির স্রোতে মুসলমান ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে পৃথক হয়ে গেল। ওরা ধ্বনি ছিল জয় হিন্দ, আমরা চাঁদ তারা মার্কা ব্যাজ পরে জিগির তুললাম- পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবির ইত্যাদি। সিরাজদ্দৌলা নাটক ওদের সাথে রেষারেষি করে আলাদাভাবে একরাতে মঞ্চস্থ করল ক্লাশ টেনের মুসলমান ছেলেরা। আমার মামা মন্টু কাজী ছিলেন তার নেতা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের ছাত্র সদস্য। সে সময় ক্লাশ টেনে পড়তেন। নাটক শুরুর পর হিন্দু ছাত্ররা একযোগে হল ত্যাগ করল। সে নাটক ওরা দেখল না। আরো কত গল্প। এটাই ছিল ওই সময়ের এক বিশেষ পারসপেকটিভের প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া চিরস্থায়ী কি? ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বিশ্বাস, আচর ভক্তি সময়ের প্ররোচনায় মানুষের মূল সত্ত্বাকে ঢেকে দ্যায়। অস্বীকার করে ভাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্ব, জাতিত্ব। এত যে হানাহানি তার

মূলে যে শ্যেণী স্বার্থ তাকে চিনতে সাদারণ মানুষ ভুল করে তখনো কাকিনাকে সে পর্যায়ে অতটা বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় বা সাম্প্রদায়িকতায় পৌঁছতে দেখিনি। যারা কাকিনাকে ত্যাগ করে ভারতে গেল, তারা কেন গেল সে কারণ ওদের দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা দরকার। খুশী নয়, ওরা নতনেত্রে বিষন্ন হয়ে চলে গেছে। তবে ভয়ে, সন্ত্রাসে, পালানো নয়। যেমন বাংলার হিন্দু উদ্বাস্তুরা কলকাতায় বা তার উপকণ্ঠে মানবেতর জীবন কাটিয়েছে। শান্তিময়ী কাকিনায় ৪৭ সালের বা পরবর্তীকালের শূন্যতা বেদনাদায়ক ছিল। কলরবমুখর ভিটেগুলো শূন্য পরে ছিল। পেছনে আমাদের কাকিনাবাসীর হিংসার কোন আগুন ছিল না। যে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে এই উপমহাদেশ পঙ্গু হয়ে আছে, মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব আজও যার চিকিৎসা মেলেনি। সেই পটভূমিকায় আমাদের মূসলমান কৃষিজীবী শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ কাকিনায় কত যে সুস্থ ছিল তার সাক্ষী দিতে আমার আনন্দ হয়।

আমার বালক বেলার স্মৃতিকথনে কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্কুলকেই মূল চরিত্র বলব। সেই ৪৭ সালে এক রাতে আমার আবুল ভাইজান দড়াম করে বন্ধুক ফায়ার করে দিলেন। জানলাম পাকিস্তান কায়েম হল। পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানী হয়ে গেলাম। কাকিনার পাকিস্থান পর্বে প্রবেশ ঘটল। পুরোনো ধরাবাহিকতায় কিছু পরিবর্তন হল। কিছু নতুন মানুষ বসতি গড়ল। স্কুলে নতুন শিক্ষক এল। কিছু ভগ্নাংশ, কিছু অবশিষ্ট নিয়ে কাকিনা পুরোনো ঐতিহ্য ও পুরোনো স্মৃতি বুকে করে কাটিয়ে দিল অনেকটা সময়। এরপর আবারও পটপরিবর্তন পাকিস্তানের আইয়ুব ইয়াহিয়া গং সামরিক শাসক, আমলা, বুর্জোয়া, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাঙালীদের জীবন জীবিকার অধিকার নিয়ে লড়াই বেঁধে গেল। ১৯৫৮ সাল তখন ষাট দশকের দিকে পা বাড়িয়েছে।

আমার ছাত্রাবস্থার পঞ্চাশ দশকের কাকিনা বা তারও পরের ছবিটা এখনোতো ম্লান হয়নি। আমার স্কুল, শম্ভুসাগরের তীরে বালিকা বিদ্যালয়, রাজবাড়ি হাটবাজার, নদীতীর, শিকার, উৎসব অনুষ্ঠান, মিলাদ, মহররম, শবেবরাত, ঈদ, পূজা, পূজা হাটি (মেলা) নাটক, যাত্রা থিয়েটার সব মিলিয়ে যে কাকিনা তাই তো একটা সত্বা আমার কিশোর স্মৃতি।
কত যে গল্প শুনতাম, ভূতের গল্প, পেত্নীর গল্প, জ্বীনের গল্প, শ্মশানের গল্প, কবরের গল্প শিকারের গল্প, আরো কত যে গল্প। কৈশোর-যৌবনের (৪৫-৬০) সময়কালটা ছিল এমনি গল্পময়। এমনকি কলেজে পড়ার সময় ছুটিতে বাড়ি আসলে গল্পের আসর বসত। গানের আসর বসত। ডা: মনসুর জান্দা বাবু আমার কাজিনরা আসর জমাতেন। গল্পগুলো কখনো ছিল গা ছমছমে, কখনো হাসির, কখনো কৌতুহলের। পুরনো সেই দিনের কথায় কাকিনাই যেন কথা বলত। এ্যাই তবে শোন - বলে কাকিনাই যেন কথা শুরু করে দ্যায়।

কাকিনার জীবন স্মৃতির এই যে পৃষ্ঠা ওলটানো, ব্যক্তিগত হোক, সার্বজনীন হোক বিস্মৃতকালের এই ইতিবৃত্ত কাকিনার অতীত।

কাকিনা এম আর এস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিষয়বস্তু

সাবেক রংপুরে জেলার এবং বর্তমান লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কাকিনা রাজ এস্টেটের জমিদার (রাজা উপাধিধারী) মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌদুরী তার পিতামৃত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার জন্ম তারিখ ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুছিল ১ এপ্রিল, ১৯০৯ইং সাল। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন নতুন ভবন নির্মাণ করেন নাই। জমিদার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জাদুঘর ছিল। উহাতেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য ব্রবস্থা করেন। যাদুঘরটির দৈর্ঘ ৯৫ ফুট, প্রস্থ ৭৫ ফুট, উচ্চতা ১৮ ফুট, দেয়াল ৩০ ইঞ্চি, মধ্যস্থিত ৪০ ফুটী ৬০ ফুট সাধারণ কক্ষ। সাধারণ কক্ষের বাহিরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রধান শিক্ষকের কার্যলয়। তার পর ওপর দিকে অপিস কক্ষ এবং ছাত্রীদের বিশ্রামাগার ছিল। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল ৯ম শ্রেণীর কক্ষ, উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল ১০ম শ্রেণীর কক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল শিক্ষক সাধারণ কক্ষ। তাছাড়া সাধারণ কক্ষের পূর্বাংশে নড়চড় করা বিশিষ্ট বেড়া দ্বারা ছোট বিষয় পাঠদানের শ্রেণীকক্ষ। সাধারণ কক্ষের পশ্চিমাংশ জমায়াতে জোহর নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল। মূল ভবনের উপর দিকে একটি টিনের ঘরে ৭ম শ্রেণীর এর পূর্বদিকে আর একটি টিনের ঘরে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য ব্যবস্থা ছিল।

১৯১০ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। তার পর মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। পাকিস্ড়ান সৃষ্টির প্রথম ভাগ পর্যন্ড় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবেই মঞ্জুরি ভোগ করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারের নির্দেশেই সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্থায়ীভাবে মঞ্জুরি ভোগ করে আসছে। এ বিদ্যালয় প্রথম তৃতীয় শ্রেণী হতে পাঠদান শুর হয়েছিল বলে জানা যায়। এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই ১৯১৬ সালে ১০ম শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং ১৯১৭ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিককুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ছিল। পরবর্তীতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিদ্যালরে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন আছে।

কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের উলে-খযোগ্য সাবেক প্রধান শিক্ষকবৃন্দের তালিকা :

১) সি পি এন হোর (এসং লো-ইন্ডিয়ান)
২) মি. গিরিজা শংকর রায়, বিএল
৩) জনাব আকরব হোসেন বিএবিটি
৪) জনাব আবদুল বারী- বিএডিপইন-এড
৫) জনাব আজিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) বিএ
৬) জনাব আবদুস সালাম- এম এ
৭) জনাব আমিনুর রহমান- বিএএসএড
৮) জনাব আবদুল গণি- এম এ
৯) জনাব কাজী আলতাফুর রহমান- বিএ
১০) জনাব আবদুল কাদের (ভারপ্রাপ্ত)- বিএবিএড
১১) জনাব রউফ- বিএবিএড
১২)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা ছাত্রগণ হলেন কবি ফজলুল করিম, মোঃ আমীন, উকিল আজগার আলী, অধ্যাপক আবদুস সালাম। এ বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী দেশে এবং বিদেশে কর্মরত আছে। পূর্বে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৫০-২০০ পর্যন্ড় ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা হয়েছে ৭০০/৮০০।

বিদ্যালয়ের মূল ভবনের চারদিকের জায়গা জমি কাকিনার জমিদার প্রদান করেছিলেন। ১৯৩১ সালে জমিদার কোর্টস অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ হয়। বিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে প্রাপ্ত জমি সিএস রেকর্ডে খাজনা যোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ ভারত সরকারের অধীনে জমিদারী পরিচালক (ম্যানেজার) কাকিনা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ৯.৮০ (নয়) একর জমি পত্রের মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পর বিদ্যালরে জায়গড়া জমির খাজনা পরিশোধ না হওয়ায় বিদ্যালয়ের জায়গা জমি খাস ঘড়িয়ালে থেকে যায়। এমতাবস্থায় কাকিনা আঞ্চলিক রাজস্ব অফিস হতে

ক্ষতিপূরণ করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। তখন জমি রক্ষার জন্য তুষভান্ডার উপজেলা মুনসেফ কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। বিদ্যালরে পক্ষে মামলা পরিচারনা করেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের সাহেব। বিজ্ঞা আদালতের রায়ে বিদ্যালরে ৭.৯৯ একর জমি স্বত্ব হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়। ইতোপূর্বে সরকার মঞ্জুরিকৃত টাকার দ্বারা মূল ভবনের পার্শ্বে বিজ্ঞানাগার স্থাপনের জন্য ১.০০ একর জমি পত্তন লওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের একটি পুকুর ১.০৬ এবং পশ্চিম পার্শ্বের পুকুর ১.১৬ যাহা রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরীর বিধবা স্ত্রীর নিকট হতে আমমোক্তার নামা প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সাবেক সম্পাদক মরহুম ইয়াছিন আলী হাছান (পুটু মিঞা) সাহেব রানী শান্ড়িবালা রায় চৌধুরানীর পক্ষে দানপত্র দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বের .৮১ (একাশি) শতক জমি এবং বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বের .৩৮ শতক জমি কবলামূলে ক্রয় করা হয়। এভাবে বিদ্যালয়ের সর্ব মোট জায়গা জমির পরিমাণ হয়েছে ১২.৪০ একর।

বিদ্যালয়ের মূল ভবনের উত্তর পার্শ্বে বিশাল এলাকার মধ্যে খেলাধুলার মাঠ ছিল। উহা পরবর্তী সময়ে আবাদি জমি হিসেবে রূপান্ড়র করা হয়। যার ফলে বিদ্যালয়ে আয় বৃদ্ধির উৎস সৃষ্টি হয়। পুরাতন খেলার মাঠের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের মূল ভবনের দক্ষিণ পার্শ্ব সংলগ্ন জায়গায় বর্তমান খেলার মাঠ স্থাপন করা হয়েছে।
কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও জায়গা জমি প্রাপ্তির সঙ্গে জমিদারের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ড় ঘনিষ্ঠ। তাই প্রতিষ্ঠাতা এবং যার স্মরণে প্রতিষ্ঠা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে য়। কাকিনা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামনারায়ণ চৌধুরী। জমিদারী তালিকায় ৫ম জমিদার ছিলেন শম্ভুচরণ রায় চৌধুরী। তিনি রামকমল মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার নতুন নাম রাখেন মহিমা। ইনি জমিদারী তালিকায় ৬ষ্ঠ জমিদার। তার মৃত্যুর পর তার যোগ্য পুত্র মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী পিতার নাম চিরস্মরণী রাখা এবং এলাকায় শিক্ষা বিস্ড়ারের জন্যই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

অনন্য আব্দুল আজিজ

গোলাম মোঃ হাছান

আবদুল আজিজ একটি নাম আত্মৎস্বর্গের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ..... সালে বাবা মার ..... সন্ড়ান হিসাবে কাকিনা চাপারতল গ্রামে জন্ম। বাবা বছির উদ্দিন মুন্সী, মা----------। মুন্সী সাহেব ছিরেন রাজ স্টেটের অনুদান প্রাপ্ত রাজবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম তথা তদানীন্ড়ন মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।
জন্মের পর আবদুল আজিজ প্রাথমিক পাঠ সমাপনান্ড়ে কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন করেন। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন বরাবর শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করতেন। বিএসসি পাশ করার পর কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। যতদুর জেনেছি অবিভক্ত কালীগঞ্জ থানার তিনজন গণিত শিক্ষকের নাম কররে আবদুল আজিজ ছিলেন তিনের এক।
প্রসঙ্গ এটা নয়, প্রসঙ্গ আত্মত্যাগের। তদানীন্ড়ন পাকিস্ড়ান সরকার আইন করে বিএসসি গণিত ছাড়া সেকেন্ডারি সেকশনের অনুমোদন বাতিল করা হবে। স্বর্গীয় রমেন বাবুসহ আজিজ সাহেবের নিয়োগ পত্র এসেছে পিডিবি রংপুর থেকে যোগদানও করবেন তিনি।

প্রসঙ্গত উলে-খ করতে হয়, তদানীনন্ড়ন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সম্পাদক মরহুম ইয়াসিন আলী হাসান যিনি পুটু মিয়া নামেই বেশি পরিচত তার সুযোগ্য পরিচালনায় পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে ষাট দশক যা ছিল কাকিনা হাই স্কুলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় কি ছিল না তখন কাকিনা স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সপ্তাহে, ডিবেটিং, টেপরেকর্ডিং, কালচারাল, ফ্যাংশন, উপস্থিত বক্তৃতা, ম্যানিয়াল লেবার রাস্ড়া, বাধা জঙ্গল কাটা, বাৎসরিক নাটক, দেয়াল ম্যাগজিন প্রতিযোগিতা। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট বেজবল, রিং, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, বাগাডোল তাও আবার আন্ড়ঃশ্রেণী প্রতিযোগিতা। আর এসবের ক্ষেত্রে ছিল সেক্রেটারি সাহেবের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, শিক্ষকের ন্যায় নিয়মিত স্কুল আগমন প্রস্থান, প্রধান শিক্ষক সাহেবের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে নাম ১০ম শ্রেণীতে নিয়মিত ইংলিশ ক্লাস নেয়ায় তিনি ছিলেন বিষয় শিক্ষকের ন্যায় সজাগ।

যা বলছিলাম সুযোগ্য সেক্রেটারি সাহেব তার মিয়া ভাই বছির মুন্সী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কথা বললেন, চা খেলেন, উঠে আসার সময় যেন নিজের অজান্ড়ে টেবিলে একটা নতুন তালা ফেলে ধীরপদে বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসছেন। হঠাৎ আজিজ সাহেব্ দেখলেন চাচা য়িা (সেক্রেটারি) ভুলে তালাটা ফেলে যাচ্ছেন তাইতো তালাটা হাতে নিয়ে তিনি চাচামিয়াকে ডাক দিলেন চাচা তালাটা আপনি ভুলে ছেড়ে যাচ্ছেন। সেক্রেটারি সাহেব জবাব দিলেন বাবা তালাটা ভুলে ছাড়ছি না তুমিতো পিডিবিতে যোগ দিচ্ছ কাকিনা স্কুল জুনিয়র স্কুল হবে তা সেকেন্ডারি সেকশনের তালাটা তুই নিজ হাতে লাগিয়ে দিয়ে যাস।

গর্বে আজিজ সাহেবের বুকটা যেন ফুলে উঠল ভাবতে লাগরেন একদিনে সরকারি চাকরি আর দিকে কাকিনা হাই স্কুলের অস্ড়িত্ব বলতে হয় ইমোশনালী সিদ্ধান্ড় নিলেন হাজারো নতুন প্রজন্মের স্বার্থে কাকিনা স্কুলে তার থাকাটাই বড়- তাইতো পিডিবি এপয়েন্টমেন্ট ইগনোর করে কাকিনা স্কুলেই থেকে গেলেন। ভাবতে অবাক লাগে পূর্ব পাকিস্ড়ান আমলে একজন সাইন্স গ্র্যাজুয়েট পিডিবিতে জয়েন করলে শেষ পর্যন্ড় তার অবস্থান কোথায় গিয়ে ঠেকত। আত্মত্যাগ আর কাকে বলে।
ব্যক্তি জীবনে তিনি অধিক সন্ড়ানের জনক- কিন্তু কি দিয়েছেন তিনি প্রাথমিক বৃত্তি, জুনিয়র বৃত্তি, এসএসসি, আজিজ সাহেবের ছেলে বা মেয়ে আছে তো কোন কথাই নেই- সেই প্রতিষ্ঠানের নাম সে বছর সেরাদের তালিকায় থাকতেই হবে- এ যেন এক অঘোষিত আইন। ১৯৮৯ সালে তো তার মেয়ে শওকত আরা শাহী এসএসসিতে হিউম্যানিটিজ গ্র"প-এ সেভেন্থ স্ট্যান্ড করলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়য় কোথায় অভিভাবকত্ব করেননি তিনি।

সেক্রেটারি সাহেব অবশ্য তাকে অংংঃঃ. ঐবধফ গধংঃবৎ চড়ংঃ দিয়ে কিছুটা হলেও তার আংশিক মূল্যায়ন করেছিলেন। ২০০৪ সালে তিনি তার শিক্ষকতা জীবনের অবসান ঘটিয়ে অবসরে গেছেন। তবে বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখলে কেন জানিনা বার বার একটা জবাব আসে আমরা তার আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। তার ঋণের কিয়দংশও বোধ হয় শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছি।

সোনালী অতীত

আমিনুর রহমান

অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে কেউ ভোলে না। আমার পক্ষে কাকিনার সোনালী অতীত ভোলা সত্যিই কঠিন। কারণ বলতে গেলে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তথা সোনালী অতীত তা যত স্বল্প সময়ের জন্য হোক না কেন, কাকিনাতেই কেটেছে। মনের মণিকোঠায় সেই দিনগুলি আজও ভাস্বর। কাকিনার মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বকনিষ্ঠ একজন তরুণ প্রধান শিক্ষক হিসেবে সম্ভবত আমিই দায়িত্ব পালন করি। বলা চলে শখের বশেই এই স্কুলে যোগদান করি। কেননা, স্বাধীন কর্মজীবনই আমার পছন্দ বরাবরই, তাই জীবনে কোনদিনও আমি সরকারি চাকুরী করিনি বা সরকারি চাকুরীর জন্য চেষ্টাও করিনি।সেই সময়ে কাকিনা শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলায় তৎকালীন রংপুর জেলায় একটি শীর্ষ স্থান দখল করেছিল। বলাবাহুল্য, কাকিনার ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ।।

১৯৬৪ সালে আমি কাকিনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঘেরা রেইনট্রী পরিবেষ্টিত এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত কাকিনা হাই স্কুল। স্কুলটি চলত সরকারি স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী। এর কোন ব্যতিক্রম হতো না। স্কুলে যোগদান করে আমার সহকর্মী হিসেবে যে ক'জন আদর্শবান শিক্ষক পেয়েছিলাম তারা হলেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজার রহমান এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব আলতাফুর রহমান, খোরশেদ আলম, আবদুল কাদের, মালাকার মহাশয়, মৌলানা আইয়ুব আলী, আবদুল আজিজ, নূরুন্নবী, স্নেহাশীষ দাশ, আলতাব হোসেন, নিজাম উদ্দিন ও আনছার আলী প্রমুখ। দপ্তরীর দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে কছিমুদ্দিন ও তছলিম উদ্দিন। আমার রান্নার দায়িত্বে স্কুল কর্তৃপক্ষ যাকে দিয়েছিলেন তিনি লাল বাপাই নামে নিজেকে পরিচয় দিতেন এবং তিনি কোন এক সাহেবকে ইলিশ মাছ রান্না করে খাইয়েছিলেন বলে দাবি করতেন।

জনাব ইয়াসীন আলী হাসানের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে কাকিনার যে কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি স্কুলটির প্রতি সুদৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সর্বজনাব মোঃ আমীন এডভোকেট, ডাক্তার আবদুল হামিদ, মোঃ ইসহাক, মোঃ ইউসুফ, আজিজার রহমান, মাহবুবার রহমান, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক আবদুস সালাম, কবি-নাতি ওয়াহেদুন্নবী সুফী, আছির উদ্দিন, বছির উদ্দিন, আব্দুর রহমান, খিজির উদ্দিন, আবদুল লতিফ , ইদ্রিস আলী মৃধা, আবদুল হাই , আজিজ মিয়া, মির বকস, আজগর আলী প্রমুখ। এ ছাড়া রয়েছেন, শ্রদ্ধেয় প্রতাব বাবু, লাহিড়ী বাবু, অখিলেশ্বর বর্মা প্রমুখ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কাকিনা উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা কিনা খেলাধুলায়, শিল্প সংস্কৃতিতে ও নাট্যচর্চায়ও সমৃদ্ধ ছিল। ফুটবল খেলায় স্কুলটি জেলার মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রেখেছিল। অবশ্য মূল প্রতিযোগিতা হতো তুষভান্ডার হাই স্কুলের সঙ্গে, তবে কাকিনা হাই স্কুল সব সময় এগিয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমিও নিয়মিত ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের উৎসাহ যোগাতাম। সেই সময় কাকিনার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল বেশ উন্নত। সাধারণ মানুষজন ছিলেন শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষকদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এই জনপদের লোকজন ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময়ও হিন্দু মুসলমানদের সম্প্রীতির বন্ধন ছিল অটুট এখানে। এই অঞ্চলের মানুষের পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেই সময় এক প্রলয়ংকরী বন্যায়। চরাঞ্চলের লোকজন যখন বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে চলছিলেন তখন এখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাকিনা এক্ষনে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, প্রগতির দিকে। ডক্টর মোজাম্মেল হক এবং স্থানীয় আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ সুযোগে আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই যে আমার ছাত্র এবং কাকিনার সুযোগ্য সন্তান, যারা বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লালমনিরহাট জেলায় শেখ ফজলল করিমের নামে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

আমি কাকিনা উচ্চ বিদ্যালয়ের দেড়শ' বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি এবং সেই সঙ্গে আয়োজকদের এই মহতি উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমিনুর রহমান এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট। তিনি ষাটের দশকের মধ্যভাগে কাকিনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

আহমেদ আলী

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন এক পাতায় অনেক ছবির সমারোহ। থরে থরে সাজানো অনেক কথা, অনেক ঘটনা। লিখতে বসে মনে পড়ছে এক এক করে ১৯৫৭-৫৮ সাল। খালাতো ভাইয়ের হাত ধরে স্কুলে পদার্পণ। সেই সাথে শুরু হয় কাকিনার সামগ্রিক চিত্রের অবলোকন কখনো বা টিফিনের ফাঁকে বন্ধুদের সাথে, কখনো বা দুষ্টামির গোল্লাছুটে। সুযোগ পেলেই বন্ধুরা মিলে উঠে পড়তাম রাজাবাহাদুরের সুউচ্চ চিলেকোটায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে, যেখান থেকে কাকিনার পুরো ছবিটাই দেখা যেত। যেন রাজবাড়িটাই কেন্দ্র। উত্তর ও পূর্বের সাজানো বাগানের তছনছ অবস্থা, পশ্চিম ও দক্ষিণের নদী গর্ভে বিলীন হওয়া সর্বশান্ত করুণ চেহারা। পূর্ব দিকে ভেঙ্গে যাওয়া পীচ ঢালা পথটি চলে গেছে কাকিনার হাট পর্যন্ত। চৌরাস্তা পার হয়ে রাস্তার দুধারে লম্বালম্বি ছড়িয়ে সুপ্রশস্ড় গোডাউনগুলো যা থেকে প্রতীয়মান হয় কাকিনার ব্যবসায়িক অবস্থান। এর পাশেই কাকিনা বাজার, যেখানে ছিল অনেক বড় বড় দোকানঘর, যা কমপক্ষে ২/৩ হাজার বর্গফুটের কম না। এটা ছিল প্রতিদিনের বাজারের জায়গা। সাপ্তাহিক হাটের জায়গা ছিল পীচ ঢালা রাস্তার শেষ মাথায়। রাস্তার পাশে ছিল রাজকার্যে সহায়ক অনেক সুশিক্ষিত লোকের আবাস। তাদের যাতায়াতের রাস্তা ছিল সুবৃহৎ এবং সুবিস্তৃত মেহগিনি গাছের ছায়ায় সুশীতল। সেগুলোর পরিধি ছিল ৮ থেকে ১২ ফুটের মতো। শুনেছি রাজপথ রাতে আলোকিত করার ব্যবস্থাও ছিল তার নমুনা আমার চোখে পড়েছে চৌরাস্তায় তহশিল অফিসের সামনে। পাকা রাস্তা চৌরাস্তা থেকে দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত ছিল। পার্শ্বে ছিল স্কুল, বাড়ি, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পুজাবাড়ি। শম্ভু সাগরের পাড়ে নদীগর্ভে আমি ঝুলতে দেখেছি পুজার বেদি।

কেন যেন উত্তর দিকটা পূর্ব ও দক্ষিণের মতো সাজানো ছিল না। তবে খোলা মাঠের কাছাকাছি কবিবাড়িসহ বিস্তৃত ছিল বেশ কিছু গুণী ব্যক্তিদের আবাস। তার মধ্যে নামকরা ছিল সতীশ চন্দ্র রায়ের জমিদার বাড়ি। পশ্চিমের পুরোটাই নদীগর্ভে বিলীন দেখে মনে হতো এই তছনছের পিছনের রহস্য কি? ।

৫৫ সালের দিকে কাকিনা যেন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। এক এক কওে সব আলো নিভে পোড়ো বাড়ির আঙ্গিনা জুড়ে তৈরি হলো ঝোপঝাড়, বাসা বাঁধল অজগর, শুকুর ও বনবেড়ালেরা।

এই দুরাবস্থা থেকে রেহাই পায়নি কাকিনা স্কুল। ভাল ভাল স্থানীয় শিক্ষক ও ছাত্রের অভাবে হয়ে গেল পঙ্গু। কেটে ফেলা হলো স্কুলের মূল ভবনের পশ্চিমে সাজানো ফুল ও ফলের অনেক গাছ, যেগুলো আমার চোখে আর কোথাও পড়েনি। বেহাত হলো স্কুলের অনেক সম্পত্তি, নিজে মেট্রিক পাস হয়েও রাখা মাস্টারকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল দশম শ্রেণীর অঙ্ক শেখাবার। সম্ভবত এটাই ছিল ক্লাইমেক্স। স্কুলে আসলো আজিজ ভাই, স্নেহাশীষ দাস। মোড় ঘুরতে শুরু করলো, সোচ্চার হয়ে উঠলাম আমরা। সমবেত হলাম ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক তহশিল অফিসের সামনে। আমার আজও মনে আছে আমার আবেদনে সাড়া সবাই দিল। স্কুলের উপর থেকে কালো হাত বিদায় নিল। তবে তখন স্কুল নিঃস্ব। ভরসা ক্রমোন্নতির আশার এক ফালি মেঘ। কিন্তু কাকিনার সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে স্থানীয় লোকের বড়ই অভাব। ফলে মুখ থুবড়ে পরে থাকতে হলো স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত। তবে স্থানীয় কাকিনা স্কুলের ছাত্র সোচ্চার ছিল।

আহমেদ আলী: পেশা শিক্ষকতা। তিনি কাকিনা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ১৯৭৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

হাওয়াখানা- এটি মূল নাম নহবত খানা। প্রতিদিন ভোরে এখান থেকে সানাই ও অন্যান্য বাদ্যযত্র বাজিয়ে নগরবাসীকে দিবসের সূচনার বার্তা জানিয়ে দেয়া হতো। এটি অবজারভেশন টাওয়ার বা ঘুরানী দালান হিসেবেও পরিচিত। অপূর্ব নির্মাণশৈলীর এই টাওয়ারটি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে হয়। এখান থেকে রাজ অন্দরবাসিনীরা মেলা, পূজা পার্বন ইত্যাদি দেখতেন। শম্ভু চন্দ্র রায়ের আমলে নির্মিত।

নালান খামার মসজিদ : পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয়। চলতি বছর (২০০৯)-এর একতলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৮৮ সালে মো: খালেকুজ্জান হেলালের উদ্যোগে কাকিনা শিশু নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমের দিকে কাকিনা হাইস্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পুরানো তহশিল অফিসে এর ক্লাস হয়। পরে স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

কাকিনা পুরানো তহশিল অফিস।

১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে এটি নির্মিত হয়। প্রথমে এটি মহাফেজখানা ছিল। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী জমিদারী কোট অব ওয়ার্ডসে ন্যাস্ত হলে এটি ম্যানেজার কার্যালয়ে পরিণত হয়। এরপর কালীগঞ্জ থানা রেভিনিউ অফিস এবং বর্তমানে এটি উত্তর বাংলা জনমিলন কেন্দ্র ।

মুকুন্দ সবোবর : এখন এই জলাশয় চাত্তার দিঘী, ধোপার দিঘী বা বোচার দিঘী নামে পরিচিত। ১৮৬০-১৮৬২ সালের মধ্যে এটি খনন করা হয়।

এখানে রাজা মহিমা রঞ্জনের চিতাভস্ম প্রোথিত করা হয়। স্থানটি মহাফেজখানা বা ম্যানেজার হাউস বা বর্তমান জনমিলন কেন্দ্রের পশ্চিমে অবস্থিত।

কাকিনা হাট মোস্তাফারিয়া কামিল মাদ্রাসা। ১৯৫২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এটি হাজী দারাজ আলী, আলহাজ নিজাম উদ্দিন, আবদুল গণি (বাণীনগর), রাজ মোহম্মাদম, জামাল উদ্দিন, মশর উদ্দিন - এর উদ্যোগে এবতেদায়ী মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আলহাজ মকবুল হোসেন, খবির উদ্দিন (সাবেক চেয়ারম্যান), আলহাজ মেছের আলী, মনছের আলী প্রমুখ এই মাদ্রাসা উন্নয়ন ও পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন কাকিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
রেইনট্রি : কালের সাক্ষী এই রেইনট্রি। এমন আরো অসংখ্য রেইনট্রি, মেহগনি, জারুল, অর্জুন, আম, বট-পাকুড়সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ গাছালিতে কাকিনা ছিল সুশোভিত। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে কাকিনার প্রকৃতি পর্যন্ড় উজাড় হতে থাকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে টিকে আছে কেবল এই একটি রেইনট্রি । রুদ্র রায়ের জমিদারীর সময় ১৭২৭ থেকে ১৭৬৮ সালের কোন একসময় বৃক্ষটি রোপণ করা হয়। কাকিনা জমিদারীর সাক্ষী এই রেইনট্রি কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের দেড়শ' বছর পূর্তি উৎসবেরও সাক্ষী হয়ে র'লো।

নয়াদিঘী : ১৭৯০-১৭৯৫ সালের মধ্যে কাকিনায় রাম রুদ্র রায় চৌধুরীর জমিদারীর আমলে গোপাল রায় এই পুকুরটি খনন করা হয়। এর পূর্ব পাড়ে এখন ১৭ জামায়াতের ঈদগাহ মাঠ।

শম্ভু চন্দ্র চ্যারিট্যাবল হাসপাতাল। ১৮৬০ সালে এ নির্মিত হয়। হাসপাতালে সে সময়ে উন্নতমানের আউটডোর ইনডোর সুবিধা ছিল। এর আবাসিক চিকিৎসকও ছিল। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় রাণী শান্তিবালা দাতব্য চিকিৎসালয়। বর্তমানে ভবনটি পরিত্যাক্ত। এর পাশেই নির্মিত হয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

কাকিনা রাজার অনুদান প্রাপ্ত মসজিদটি তিস্তার ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার পর অনুদানের অর্থ তোলটারীর এই জামে মসজিদকে প্রদান করা হয়। সে সময় মাসিক ৫ টাকা হারে এই অনুদান দেয়া হতো। পরে এই অনুদান কাকিনা বাজার জামে মসজিদে স্থানান্তর করা হয়।

জমিদার শম্ভু চন্দ্র রায়ের আমলে খনন করা হয় এই বিশাল জলাশয়টি। জলাশয়টির উত্তর ঘাটে বাঁধানো শ্বেতপাথরের নেমপ্লেটটি এখনো রয়েছে।

শম্ভু সাগরের ঘাট

উত্তর বাংলা কলেজের ক্যাম্পাসে পূর্বদিকে নির্মিত গুরুনানক গ্রন্থাগার।
কাকিনা হাট মশর উদ্দিন - নিজাম উদ্দিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও শহিজন নেছা এতিমখানা

ইতিহাস

ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে সভ্যতার আদিভূমি যে প্রাচীন জনপদ এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে কাকিনা। হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া ও ধরলা বিধৌত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জনপদ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ছিল সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত । মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের তথ্য বিচারে কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত হচ্ছে যে খ্রিস্টের জন্মের ৫ হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষের এই পূর্বভাগে সভ্য সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যামন ছিল। এরপর এই অঞ্চলে প্রাগজ্যোতিষ, লৌহিত্য, কামরুপ ও কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় বর্মা, পাল আরো কয়েকটি রাজবংশ ও রাজ্য । ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় মহারাজ বিশ্ব সিংহ (বিশু) ১৪৯৬ সালে কোচবিহার রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। এই কোচবিহার রাজ্যের ৬টি পরগণার মধ্যে একটি কাকিনা। কাকিনা জমিদারীর সময়কাল ছিল প্রায় আড়াইশ বছর। দীর্ঘ এই সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস জমিদারীর শুরুতে এর আয়তন ছিল প্রায় ২৫০ বর্গ মাইল। পরবর্তীতে এই পরিধি বেড়ে দাঁড়ায় ৪শ বর্গমাইল। পাটগ্রাম উপজেলা বাদে প্রায় সম্পূর্ণ লালমনির হাট জেলা ছিল কাকিনা জমিদারীর আওতাভুক্ত। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ, মহিমাগঞ্জ, আরো অনেক স্থানে ছিল এর জোত ও তালুক। উত্তরবঙ্গে নাটোরের পরেই দ্বিতীয় বৃহৎ জমিদারী ছিল কাকিনার জমিদারী। কাকিনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ড। আলোচ্য নিবন্ধে এই বিশাল জমিদারী বংশ পরিচয়সহ কিছু তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে।

নামের উৎপত্তি : বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ, জাতি ও জনগোষ্ঠীর নাম যেমন নির্ধারিত হয়ে আসছে কাকিনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। অতীতে আজকের কাকিনা কঙ্কনা, কঙ্কানিয়া, ককনিয়া, কানকিনা, কইকিনা, কাকিনীয়া, কাকিনী এরপর কাঁকিনা নামে লিখিত ও পরিচিত ছিল। কাকিনা রাজ এস্টেটের দাপ্তরিক কাজের শেষ দিন পর্যন্ত কাকিনীয়া নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সে সময় অর্থাৎ এর ইংরেজি বানান ছিল KANKINA ও KANKANIA. তবে. রাজা মহিমারঞ্জনের আমলে দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি কাকিনা নামের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তার জমিদারীর শেষ দিক থেকে রাজ স্টেট সম্পর্কিত দাপ্তরিক কাজ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে কাকিনা নামটি পরিচিত হয়ে উঠে।

জমিদারীর শুরু

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের দেয়া সনদবলে কাকিনীয়া জমিদারীর সূচনা হয়। সে সময় অর্থাৎ ১৬৮৭ সালে ঘোড়াঘাটের মোগল ফৌজদার এবাদত খান কোচ রাজা মহিন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে এক যুদ্ধে কোচ রাজ্যের ৬টি পরগণার মধ্যে কাকিনা, ফতেপুর ও কার্যিরহাট বা কার্জির হাট দখল করে নেয়। সে সময় কাকিনা পরগণা বা চাকলার চাকলাদার ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। তখন দিল্লীতে মোগল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব ও বাংলার মোগল সুবেদার ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খাঁ এবং ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন শায়েস্তা খাঁ'র ছেলে এবাদত খাঁ।

এবাদত খাঁ পরগণা তিনটি দখলের কোচবিহারের নাজির শান্ত নারায়ণকে কর নির্ধারণপূর্বক এই তিন পরগণার জমিদারীর বন্দবস্ত করে নিতে বলেন। এতে নাজির অসম্মত হলে মোগল ফৌজদার জমিদারীর ভার অন্য কারো হাতে অর্পণ করা বা খাজনা আদায়ের জন্য তহশীলদার নিয়োগের জন্য শান্ত নারায়ণকে পুনরায় অনুরোধ জানালে এতেও তিনি অসম্মত হন। এরপর মোগল এবাদত খাঁ কাকিনা পরগণার প্রভাবশালী কর্মচারী রঘু রামের চার

পুত্রের মধ্যে রামনারায়ণকে কাকিনা ও রাঘবেন্দ্র নারায়ণকে ঘড়িয়ালগঙ্গা বা পরগণা বাষট্টির জমিদারীর সনদ প্রদান করেন।

রঘুরামের ৪ পুত্রের অপর দুই পুত্র হলেন রত্নেশ্বর ও রাজিব। পরবর্তীতে রত্নেশ্বর কোচরাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ থেকে টেপার জমিদারীও লাভ করেন।

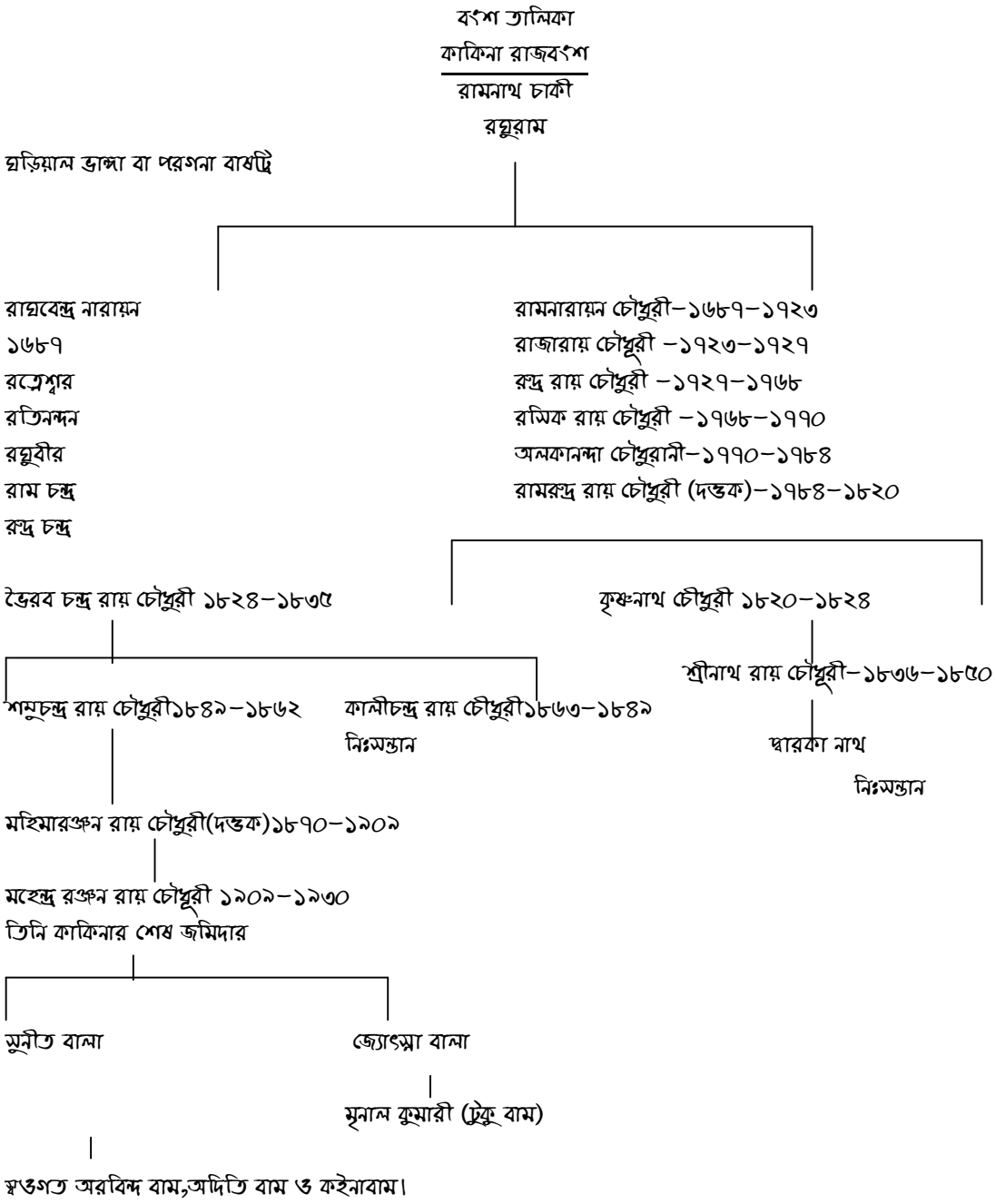

নিম্নে এর বংশ তালিকা দেয়া হলো-

বিবরণ

কোচবিহার রাজ্যের অধীন কাকিনা চাকলার সর্বশেষ চাকলাদার ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ইন্দ্রনারায়ণের নিয়োগের আগে থেকেই রঘুরাম কাকিনা চাকলার প্রভাবশালা কর্মচারী ছিলেন। রঘুরামের পিতা রামনাথ চাকী কোচরাজা প্রাণ নারায়ণের রাজ দফতরে মজুমদারের কার্যে নিয়োজিত (১৬৩৪) ছিলেন। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রঘুরামের ৪ পুত্রের মধ্যে রামনারায়ণ চৌধুরীকে কাকিনা এবং রাঘবেন্দ্রকে ঘড়িয়ালডাঙ্গা বা পরগণা বাষট্টির জমিদার ভার প্রদান করা হয়।

রামনারায়ণ চৌধুরী- ১৬৮৭ থেকে ১৭২৩ পর্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করেন। স্বরস্বতী দেবী চৌধুরাণী ও গঙ্গাময়ী চৌধুরাণী নামে রামনারায়ণের দুই স্ত্রী ছিলেন। এরমধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজা রায় ও রুদ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ রায় চৌধুরী- রাম নারায়ণের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রায় চৌধুরী জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার অনুকূলে জমিদারীর নামও জারি হয়। কিন্তু নির্ঝাট প্রকৃতির মানুষ হওয়ার ২ বছরের মধ্যে তিনি জমিদারীর ভার ছোট ভাই রুদ্র রায় চৌধুরীর হাতে অর্পণ করে গরুড় বিলের কাছে বসতবাটি নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন। রাজা রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭২৭) ছোট ভাই রুদ্র রায় বড় ভাইর নামে জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৭২৭ সালে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর জমিদারীর পূর্ণ কর্তৃত্ব রুদ্র রায়ের হাতে চলে আসে।

রুদ্র রায়- তিনি ১৭২৭ থেকে ১৭৪১ পর্যন্ত জমিদারীর পরিচালনা করেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল রাজেশ্বরী চৌধুরাণী। রসিক রায় নামে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রসিক রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকানন্দা চৌধুরাণী।

১৭৬৮ সালে রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর রসিক রায় জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় জমিদারী নিয়ে আইনগত কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। রসিক রায় অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে দত্তক নেয়ার অনুমতি দেন। মাত্র দু'বছর জমিদারী পরিচালনার পর ১৭৭০ সালে রসিক রায়ের মৃত্যু হয়।

১৭৭০ সালে রসিক রায়ের স্ত্রী অলকানন্দা জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি ১৭৭২ সালে রামরুদ্র রায় নামে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু এসময় প্রচন্ড খরায় সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রজারা খাজনা দিতে অপরাগ হওয়ায় সরকারী কোষাগারেও কাকিনা জমিদারীর খাজনা বাকী পড়ে যায়। খাজনা দিতে না পারায় রাম দুলালকে কাকিনা জমিদারীর ইজারাদার নিযুক্ত করে। এ সময় রাম দুলালের অত্যাচার ও উৎপীড়নে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং এক সময় বিদ্রোহী প্রজারা কাছারী বাড়ি পুড়ে দেয়। কোম্পানির সৈন্যদের সহায়তায় রাম দুলাল পালিয়ে প্রাণ বেঁচে যায়। এ সময় কাকিনা জমিদারীর ৪৭টি মৌজা নিলাম হয়ে যায়। এ দিকে খাজনা পরিশোধের কোন সুযোগ না থাকায় অলোকানন্দা কলিকাতায় পাড়ি জমান।

এ সময়ই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়োজিত কুখ্যাত দেবী সিংহের ১৮ প্রকার এবং তার সহযোগী হরে রামের ২১ প্রকার করের চাপে রংপুর দিনাজপূরের প্রজাদের সঙ্গে কাকিনার প্রজারা আবারো বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কোম্পানির সৈন্যদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ৬০ জন বিদ্রোহী প্রাণ হারান।

এরপর অলোকানন্দা কলিকাতা ফিরে এসে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর মূর সাহেবের কাছে আবেদন জানিয়ে ১৭৮৪ সালে দত্তক পুত্র রাম রুদ্র রায় চৌধুরীর নামে জামিদারীর নাম জারি ব্যবস্থা করেন। ১৮০১ সালে অলকানন্দার মৃত্যু হয়।

রাম রুদ্র রায় ১৭৮৪ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করেন। কাত্যায়নী বা গৌর সুন্দরী, রামমোহনী ও রাম মনি নামে তার তিন স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর সন্তান হলেন রামচন্দ্র, কৃষ্ণনাথ চন্দ্র ও ভৈরব চন্দ্র এবং কন্যা কমলা। দ্বিতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন। তৃতীয় স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিল রুদ্র নাথ এবং দু'কন্যা বিমলা ও কাশীস্বরী।

তীর্থ ভ্রমণের সময় রাম রুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ভাগলপুরে বসন্ত রোগে মারা যায়। পরে ১৮২০ সালে মুর্শিদাবাদের কাছে বড়নগর নামক স্থানে স্বেচ্ছায় গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হয়ে রাম রুদ্র পরপারে গমন করেন।

কৃষ্ণনাথ ও ভৈরব ১৮২০ সালে রাম রুদ্রের মৃত্যুর পর তার দু'পুত্র পিতৃ জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনাথ কর্মবিমুখ হওয়ায় স্বেচ্ছায় জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব ছোট ভাই ভৈরব চন্দ্র রায় চৌধুরীর উপর অর্পণ করেন। জমিদারী অর্পণের ৪ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে কৃষ্ণনাথ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূবে তিনি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র শ্রীনাথের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সহধর্মিনী কৃষ্ণরমনী চৌধুরানীকে অছি নিয়োগ করেন।
১৮২৪ সালে বড় ভাই কৃষ্ণনাথের মৃত্যু এবং ভ্রাতৃষ্পুত্র শ্রীনাথ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় ভৈরব জমিদারীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। ভৈরব ১৮৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সময়ও তার দু'পুত্র কালীচন্দ্র রায় ও শম্ভু চন্দ্র রায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় স্ত্রী লবাঙ্গ চৌধুরানীকে অছি নিযুক্ত করেন। এরফলে কৃষ্ণনাথ ও ভৈরর রায়ের স্ব স্ব স্ত্রী তাদের পুত্রদের অছি হিসেবে জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৮৩৬ সালে কালীচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে জমিদারীতে তিনি তার অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত শম্ভুচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ায় লবাঙ্গ চৌধুরানী ছোট ছেলে শম্ভুর পক্ষে অছি হিসাবে থেকে যান।
এদিকে কৃষ্ণনাথের ছেলে শ্রীনাথ বয়;প্রাপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণনাথ ও ভৈরবের পুত্রদের মাঝে কাকিনা জমিদারী দু'ভাগ হয়ে যায়। উত্তরাধিকারী সূত্রে কৃষ্ণনাথের পুত্র শ্রীনাথ জমিদারীর অর্ধাংশ এবং ভৈরবের দু'পুত্র কালীচন্দ্র ও শম্ভু চন্দ্র অপর অর্ধাংশ লাভ করেন। কাকিনা রাজবাড়িতেই দু পক্ষের বসবাসের স্থান নির্ধারিত হয়। ১৮৪৭ সালে শ্রীনাথের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরী তাদের একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বারকানাথের পক্ষে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৩ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় দ্বারকানাথ মত্যুবরণ করেন। দ্বারকানাথের স্ত্রীর নাম ছিল মুক্তকেশী। এ সময় শম্ভু চন্দ রায় তীর্থে ছিলেন।
এর আগে ১৮৪৯ সালে শম্ভুর সহদোর কালী চন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন। তার প্রথমা স্ত্রী শ্যামা সুন্দরী আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কালীচন্দ্র নিজের মৃত্যুর সময় ছোট ভাই শম্ভু চন্দ্রকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী হরিপ্রিয়াকে পরামর্শ দেন। কালীচন্দ্রের মৃত্যুর পর জমিদারী কতৃত্ব শম্ভুচন্দ্রের হাতে চলে আসে।
এ দিকে ১৮৫৩ সালে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তার মাতা লক্ষ্মীস্বরী শম্ভু চন্দ্রকে তীর্থ থেকে কাকিনায় আসার বহু রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শম্ভু কাকিনায় ফিরতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। লক্ষ্মীস্বরী উপায়ান্তর না দেখে অল্প বয়স্কা মুক্তকেশীকে সম্পত্তির অছি নিয়োগ করেন। ১৮৫৬ সালে লক্ষ্মীস্বরীর মৃত্যুর খবর শুনে শম্ভু চন্দ্র কাকিনায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি পিতৃব্য শ্রীনাথের সম্পত্তি বুঝে নেন।
এদিকে শম্ভু চন্দ্র ভ্রাতৃবধূ হরি প্রিয়াকে একটি পোষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে একটি দত্তক গ্রহণ করেন। হরিপ্রিার পোষ্যের নাম রাখা হয় করুণারঞ্জন এবং শম্ভু চন্দ্রের দত্তকের নামকরণ করা হয় মহিমারঞ্জন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে করুণারঞ্জনের মুত্যু হলে হরিপ্রিয়া দ্বিতীয় পোষ্য গ্রহণের অনুমতি পান। দ্বিতীয় পোষ্য হচ্ছেন কৈলাসরঞ্জন। উল্লেখ্য শম্ভুচন্দ্র তার ভ্রাতৃবধূ হরিপ্রিয়ার ছোট বোন ব্রজঙ্গনা চৌধুরানীকে বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তীতে শম্ভুচন্দ্রের হরিপ্রিয়ার জমিদারীর হিস্যা নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। এই বিরোধ মহিমারঞ্জন পর্যন্ত গড়িয়েছিল।
মহিমারঞ্জনের পূর্ব নাম ছিল বাধা গোবিন্দ। বগুড়ার বর্তমান কাহালুর লক্ষ্মীপুর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম রাম কমল ও মাতার নাম শান্তমনি। ১৮ বছর বয়সে ব্যাধিতে কৈলাস রঞ্জনের মৃত্যু হয়।

১৮৬৮ সালে শম্ভু চন্দ্রের মৃত্যুর সময় মহিমারনুন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় বছর পর ১৮৭০ সালে তিনি জমিদারীর দায়িত্বগ্রহণ করেন। মহিমারঞ্জন ১৯০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রথম কাকিনার জমিদার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১৮৮৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজা উপাধি লাভ করেন।
১৯০৯ সালে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মহেন্দ্ররঞ্জন কাকিননার জমিদার লাভ করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে ১৯২৫ সালে জমিদারী নিলামে উঠে। এরপর মহেন্দ্ররঞ্জন সপরিবারে কালিয়াং চলে যান। ১৯৩০ সালে তিনি জমিদারী কোট অব ওয়ার্ডসে ন্যস্ত করেন। মহেন্দ্ররঞ্জন ১৯৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মহেন্দ্র রঞ্জনের দুই মেয়ে জ্যোৎস্না বালা ও সুনীত বালা। জ্যোৎস্না বালার বিবাহ হয় পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মানিক লাল ঘোষালের সঙ্গে। জ্যোৎস্না বালা ১৯০০ সালে কাকিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ সালে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। জ্যোৎস্না বালার কন্যা মৃণাল কুমারীর (টুকু বাম) জন্ম ১৯২০ সালে কলিকাতায়। আইসিএস অফিসার অরবিন্দ বাম-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়।
তাদের তিনজন সন্তান সম্পর্কে জানা যায়। এরমধ্যে রয়েছেন ১। স্বাগত অরবিন্দ বাম (২) অদিতি বাম (৩) কইন্যা বাম।
মহেন্দ্ররঞ্জনের অপর মেয়ে সুনীত বালার বিয়ে হয় ধর্মদাস ঘোষালের সঙেঞ। তাদের পরবর্তী বংশ পরিচয় জানা যায়। তিনি সুনীত বালা ১৯০২ সালে কাকিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮০ সালে বিহারের মধুপুরে মৃত্যুবরণ করেন।

বসতবাড়ী ও স্থাপনা

কাকিনা জমিদার বংশের আদিনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার ভূষণা পরগনার গাজনা গ্রামে। বর্তমান মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর। গ্রামটি মাগুরা জেলা শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত। বুকানন হ্যামিলটন তার রিপোর্টে কাকিনা জমিদারদের কোচ রাজাদের আত্মীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ওই গ্রামের রামনাথ চাকী চাকুরীর সন্ধানে কোচবিহারের রাজ দরবারে আসেন । তিনি প্রথমে কাউনিয়ার টেপা এলাকায় বসবাস করেন। রামনারায়ন চৌধুরী মোগলদের কাছ থেকে জমিদারী লাভের পর প্রথমে কাকিনার দশ মাইল উত্তরে সীতাহর কায়েতের বাটি নামক স্থানে বসতবাড়ী নির্মাণ করেন। পওে কাকিনায় বাড়ী নির্মাণ করে তিনি এখানে চলে আসেন। এরপর রাজা রায় চৌধুরী ছোট ভাই রুদ্র রায়ের হাতে জমিদারী অর্পণ করে জোত গরুড়ের কাছে বাড়ী নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন।
রুদ্ররায় চৌধুরী রুদ্রশ্বর শিব নামে এক শিবমন্দির স্থাপন করেন। তার সময় ১৭৪০ সালের দিকে কাকিনার গোপাল রায়ে বিশাল পুকুর খনন করর হয়। এটি বর্তমান নয়াদিঘি নামে পরিচিত। এছাড়াও তিনি প্রজাদের পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য বহু কূপ ও দীঘি খনন করেন। অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম নির্মাণ করেন। জাতিচ্যুতদের সমাজে গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
এর পর রাম রুদ্রর সময় রাজবাড়ীতে দক্ষিণ দুয়ারী প্রাসাদ নির্মিত হয়। বহিরাঙ্গণে দু'টি দ্বিতল ভবন, আনন্দময়ী দেবীর মন্দিও, এর সম্মুখে নাট মন্দির ও মঠ তৈরি করা হয়। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী রামমোহিনী রাম কৃষ্ণ নামে আর একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। তিনি কাশীতে একটি বিশাল বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নিকট বড়নগরে গঙ্গার তীরে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি দেবী পুরের অদূরে ঘাটুয়ায় মৌজা ক্রয় করেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী হ্যামিলটন বুকানন ১৮০৮ সালে কাকিনা ভ্রমণ করেন। তিনি তার বৃত্তান্তে কাকিনাকে অত্র অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুসজ্জিত জমিদারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রামরুদ্রের সময় টোল ও মোক্তব স্থাপনের কথাও জানা যায়। শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ পরবর্তীতে শম্ভুচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। এ থেকে একথা বলা যায় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাকিনার ইতিহাস আরো প্রাচীন।

রসিক রায় রংপুরের মাহিগঞ্জে কাছারী বাড়ী স্থাপন করেন। রসিক রায়ের স্ত্রী অলকানন্দা সিতাই নামক স্থানে অলকেশ্বর শিব মন্দির স্থাপন করেন।
ভৈরব চন্দ্র রায় চৌধুরীর সময় রাজ কাছারী মাহিগঞ্জ থেকে স্থানান্তর করে কাকিনা রাজবাড়ীর সামনে স্থাপন করা হয়।
এ দিকে জমিদারীর অপর তরফ শ্রীনাথ রায় বাজিতপুর পরগনার লাট শক্তিপুর মৌজা ক্রয় করেন। তিনি রাজবাড়ীতে তার অংশে দক্ষিণ দিকে নাট মন্দির ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। শ্রীনাথ রায়ের স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরী

চৌধুরানী স্বামীর মৃত্যুর পর ১৮৫৩ সালে রাজবাড়ীর পশ্চিমপার্শ্বে লক্ষ্মী সরোবর নামে পুকুর খনন করে। বর্তমানে রাণীর দীঘি নামে পরিচিত।

কালীচন্দ্র রায় আমনহর পরগণার লাট ফরিদপুরে মৌজা ক্রয় করেন। কাকিনা রাজবাড়ীতে অট্টালিকা নির্মাণ করেন। রাজবাড়ীর পূর্ব দিকে কালীসাগর নামে পুকুর খনন করেন। (বর্তমান আবদুল কাদেরের (শিক্ষক) বাড়ীর সামনের পুকুর)। তিনি চন্ডীমন্ডপ স্থাপন করেন। এই চন্ডী মন্ডপের একপাশে যন্ত্রণালয় (ছাপাখানা) স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ জমিদারীর শুরু থেকে কাকিনার প্রত্যেক জমিদারই বিষয় সম্পত্তির উন্নতির পাশপাশি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডেও মনোযোগী ছিলেন। অগ্রগতির এই পথপরিক্রমা শম্ভুচন্দ্রের হাতে পূর্ণতা লাভ করে।

শম্ভুচন্দ্রের আমলে কাকিনায় সাহিত্য, সংস্কৃতির ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল এর কিছু এই স্মরণিকার 'বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র' ও 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' নিবন্ধ দু'টিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া শম্ভুর আমলে চন্ডীমন্ডপ, দুর্গামন্দির, কালীমন্ডপের (কালীবাড়ী) জন্য সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হয়। খনন করা হয় শম্ভু সাগর। কাকিনা রাজবাড়ী থেকে হাট পর্যন্ত সড়কের দু'পাশে মেহগনি ও বট পুকুরসহ বিভিন্ন গাছ লাগানো হয়। ইট খোয়া বিছানো রাস্তাও নির্মিত হয়। নির্মিত হয় শম্ভুচন্দ্র চ্যারিট্যাবল হাসপাতাল। তদানীন্তন সময়ে জমিদারদের পরিচালিত এটিই ছিল একটি একমাত্র পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। এর ইনডোর ও আউটডোর সুবিধা ছিল। পরবর্তীতে এর নাম হয় রানী শান্তিবালা চ্যারিট্যাবল ডিসপেসারী।

পতিতালয় উচ্ছেদ করে এখাওে এই হাসপাতাল নির্মিত হয়। উচ্ছেদকৃত পতিতাদের অনেককেই তিনি সমাজে পুনর্বাসিত করেছেন।

১৮৬০ সালে তিনি মাহিগঞ্জে স্থাপন করেন কৈলাস রঞ্জন মিডল ভার্নিকুলার স্কুল। পরবর্তীতে স্কুলটি ধাপ কটকী বাড়ীতে স্থানান্তর হয়। মহিমারঞ্জনের সময় স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

শম্ভু সরোবরের (শম্ভু সাগর) খনন কাজ শেষ হয় ১৯৬০ সালে। কবি শেখ ফজলে করিমের আত্মজীবনী এবং স্মরণিকায় মোঃ আজহার উদ্দিনের স্মৃতিচারণায় শম্ভু সাগর সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

শম্ভুচন্দ্রের সময়েই রাজবাড়ীও নতুন সাজে সাজানো হয়। নির্মিত হয় রাজদরবার ও রাজার মূল বাসকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি প্যালেস। মাহিগঞ্জের সাবেক কাছারী বাড়ীতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয় এবং তিনি রংপুরের সাতগড়া ও ধাপে দু'টি কুটি ক্রয় করেন।

১৮৬০ সালে মাহিগঞ্জের কাচনায় ব্রিজ নির্মাণ করেন। মহেন্দ্র নগরের পাশে মৃতিকা গ্রামে (মৃত্তিঙ্গা তালুক) শম্ভুগঞ্জ হাট ও খাটা মারায় আনন্দগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। তার সময়েই চিড়িয়াখানা, যাদুঘর স্থাপিত হয়। ভেলাবাড়ীতে মহিমারঞ্জন নামে একটি জোত ক্রয় করেন। দেবীধস থানার অম্বরখানার সাড়ে ১৭ অংশ জমিদারী ক্রয় করেন। কিসমত দলগ্রাম নামে তালুক ক্রয় করেন। কাশীর বাড়ীর পাশে আর একটি বাড়ী ক্রয় করেন। এখানকার পুরাতন বাড়ীর লোকজনের জন্য নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা করেন। সে সময় নাজির রহিমুলাহ প্রশাসনিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে শম্ভুচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৫৮ সালে শম্ভুচন্দ্র একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃতি ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। বিদ্যালয়ের নাম ছিল শম্ভুচন্দ্র দাতব্য বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় শম্ভু সাগরের পূর্বদিকে স্থাপন করা হয়। এর পরের বছর ১৮৫৯ সালে বিদ্যালয়টিকে ইংরেজি ও বাংলা দু'টি বিদ্যালয়ে বিভক্ত করা হয়। ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য একটি দালান ও বাংলা বিদ্যালয়টি এর পাশে অপর একটি গৃহে স্থানান্তর করা হয়।

প্রথমে এই বিদ্যালয়ে রামচন্দ্র ভৌমিক ও ফজলার রহমান মুন্সি নামে দু'জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয় রংপুরের তৎকালীন স্কুল পন্ডিত ভীমচন্দ্র সন্যালকে। দু'টি স্কুলে পরিণত হলে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিশ্বেশ্বর সেন ও বাংলা বিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিতের পদে গগন চন্দ্র ঘোষকে নিয়োগ দেয়া হয়। শম্ভচন্দ্র মইনর স্কলারশীপ বৃত্তি পরীক্ষাও চালু করেন।

এই বিদ্যালয় দু'টি প্রতিষ্ঠার আগে তিনি একটি সংস্কৃত চতুস্পাটি স্থাপন করেন। এর অধ্যাপনার দায়িত্বে ছিলেন পন্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়।

এ সময় গরিব ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। তাদের জন্য বিনামূল্যে বইপত্র, অন্নবস্ত্র ও থাকার ব্যবস্থা রাজকোষ থেকেই করা হতো। দূর থেকে আগত ছাত্রদের বাসস্থান ও অন্যান্য সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও ছিল।

১৯০৫ সালে ইংরেজী বিদ্যালয় বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়। শম্ভু সাগরের উত্তরে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়টি (টিন শেড ঘর) ঝড়ে উড়ে গেলে ইংরেজী বিদ্যালয়ের সাবেক স্থানে এটি স্থানান্তর করা হয়। মোছা: জোবেদা খাতুনের 'আমার স্মৃতিতে বালিকা বিদ্যালয়' নিবন্ধে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণে শম্ভু সাগর এবং মুকন্দ সরোবর নামে আরও একটি বিশাল পুকুর খনন করা হয় (বর্তমান ধোপায় দিঘী বা বোচার দিঘী বা চাত্তার দিঘী হিসেবে পরিচিত)। এ সময় রাজবাড়ীর আশেপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করে উত্তর দিকে একটি সড়ক নির্মাণ করেন। এর নাম দেয়া হয় বৈকুণ্ঠ সড়ক (বর্তমান রাজবাড়ীর পিছন দিকে পালপাড়া হয়ে সতীশ বাবুর দালানগামী সড়ক)। এটিকে পরে ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সকাল ও বৈকালিক ভ্রমণের জন্য কালীবাড়ীর পূর্ব দিকে হাওয়াখান সড়ক নামে আরো একটি সড়ক ছিল।

শম্ভুচন্দ্র জমিদারদের ভূম্যাধিকারী সভা পুনরুজ্জীবিত করেন। তার আমলে ১৮৬৮ সালে একটি ধর্মসভা স্থাপিত হয়। এই সভায় প্রদত্ত ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতাসমূহ বিজ্ঞান বিনোদনী নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম সক মতের পন্ডিতেরই উপস্থিতি ছিল।

শম্ভুচন্দ্র নয়া দিঘির উত্তরে খামার বাড়ী স্থাপন করেন। এখানে ১০১ কুটির বিশিষ্ট একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। এখানে হাতিশাল ঘোড়াশালা ছিল। এই খামাওে লিচু, আমসহ অনেক রকমের ফলের বাগান ছিল। রাজবাড়ীতে তরিতরকারি, সবজি ও ফল-ফলারী জোগান দেয়ার লক্ষ্যেই এই খামারবাড়ি স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, কাকিনার মধ্য গোপাল রায় এলাকা সে সময় থেকে ভাল শাকসবজি চাষের এলাকা হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি অবকাশ কেন্দ্রও ছিল।

মহিমা রঞ্জন - কাকিনার মহিমাকে আরো বিস্তৃত করেছেন মহিমারঞ্জন। তিনি মাহিগঞ্জে কৈলাস রঞ্জনের নামে প্রতিষ্ঠিত 'কৈলাশ রঞ্জন বঙ্গ বিদ্যালয়' স্থানান্তর করে নতুন শহওে নিয়ে আসেন নিয়ে আসেন। তার সময়ে কাকিনা জমিদারীতে মহিমাগঞ্জ, তিস্তা, মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট, আদিতমারী, মোগলহাট ও কাকিনা রেল স্টেশন স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মহিমারঞ্জন বঙ্গপুর নাট্যসমাজ বা থিয়েটার হল (বর্তমান টাউন হল) নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় রংপুর স্বারস্বত সভা গড়ে উঠে। কাকিনা রাজা মহিমারঞ্জ এবং তাজহাট ও মন্থনার জমিদারদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রংপুর ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বগুড়া উডবার্ন লাইব্রেরিতে বড় অংকের অনুদান দেন।

১৮৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় ভেলাবাড়ীতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক লঙরখানার স্থাপন করেন। দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা আদায় বন্ধ রাখেন। তিনি কাকিনায় কৃষি ও শিল্প মেলার আয়োজন করে গ্রামীণ কৃষি শিল্পে উৎসাহ প্রদান করেন। জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার জন্য তিনি সচেতনতামূলক সভারও আয়োজন করেন।

মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরীর আমলে ১৯০৯ সালে কাকিনা হাই ইংলিশ স্কুে নবম ও দশম শ্রেণী যোগ হয়। রংপুর কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য। কাকিনা পাবলিক লাইব্রেরির প্রায় ৫ হাজার বই তিনি কারমাইকেল কলেজে দান করেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ নিবন্ধে মহেন্দ্র রঞ্জনের বিদ্যানুরাগ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের উল্লেখ আছে। তিনি বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। তার এই অনুদানে বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করা হয়। এই বাহিনী মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ছিলেন কাকিনা স্টেটের শেষ জমিদার। পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত সকল প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যানমূলক কর্মকান্ডে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অনুদান পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে, মহেন্দ্ররঞ্জনের জমিদারী হারানো নিয়ে প্রচলিত অনেক লেখা ও প্রচারণা প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

১৮৭৪ সালের দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের হাত থেকে কাকিনাও রেহাই পায়নি। এই দুর্ভিক্ষের সময় মহিমারঞ্জন খাজনা আদায় বন্ধসহ অনেক জন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মূলত: তার দূরদৃষ্টি ও প্রজাবাৎসল্যের কারণে সে সময় কাকিনা স্টেটের কোথায় বড় রকমের কোন অন্তোষ দেখা না দিলেও এরফলে

রাজকোষে ঘাটতি দেখা দেয়। এই দীর্ঘ মেয়াদী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ১৯০৯ সালে মহেন্দ্ররঞ্জন জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুর্ভিক্ষের ধকল সামালে উঠার আগেই ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধে কাকিনা স্টেটকে সে সময় কি পরিমাণ কেবল আর্থিক অনুদান দিতে হয়েছে এর কিছু উল্লেখ এ নিবন্ধে রয়েছে। স্টেটের এই আর্থিক অধোগতির মুখে মেয়ের বিয়েতে অতি আয়োজন মরার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবেই আভিভূত আঘাত করেছে। শেষ রাজার পক্ষে এই তিন ঘটনার সম্মিলিত ধাক্কা সামাল দেয়া সম্ভব হয়নি । মহেন্দ্ররনুনের বিলাসী জীবনের অপবাদও তথ্যগতভাবে যথার্থ নয়। এ ক্ষেত্রে কোন কোন গ্রন্থকারের লেখায় বলা হয়েছে- মহেন্দ্ররঞ্জন মদ্যপ ও বিলাসী ছিলেন। আবার এরপরই লেখা হচ্ছে যে, তিনি (মহেন্দ্র) পিতার মত জ্ঞানী ও বিদ্যান ছিলেন। প্রশ্ন জাগে, একজন জ্ঞানী ও বিদ্যান কিভাবে মদ্যপ ও বিলাসী হয়?
অপর একটি প্রসঙ্গ যে প্রজাপীড়ক হিসেবে অলকানন্দা রায় চৌধুরানীর দিকে যে অঙ্গুলী নির্দেশ করা তা কোনভাবেই ইতিহাসসিদ্ধ নয়।

সে সময় কাকিনায় প্রজা বিদ্রোহের জন্য দায়ী হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানির ম্যানেজার রাম দুলাল এবং পরবর্তীতে কুখ্যাত দেবী সিং (আলোচ্য নিবন্ধে এর উল্লেখ আছে। এছাড়া কোন কোন পুস্তকে বিদ্রোহী কৃষক নেতা নূর উদ্দিনকে ধরিয়ে দেয়ার যে তথ্য অলকানন্দার উপর চাপিয়ে দেয়া চেষ্টা করা হয়েছে তাও ইতিহাস সম্মত নয়। অবশ্য এর অনেক আগেই কাকিনায় ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। কালী চন্দ্র রায়ের সময় (১৮৩৭-৪৯) চন্ডমন্ডপের পাশে ছাপাখানা স্থাপনের তথ্য শম্ভু বংশ চবিত-এ উলে-খিত আছে। বঙ্গপুর দিকপ্রকাশ যন্ত্রণালয় বা শম্ভু যন্ত্রণালয় সম্পর্কে শামসুল হকের লেখা একটি বিবৃত প্রবন্ধ এই সরণিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এখানে এটুকু উলে-খ্য যে, ১৯১৪ সালের পরও কাকিনা থেকে প্রকাশিত বঙ্গপুর দিক প্রকাশ পত্রিকা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়।

কবি- সাহিত্যিক

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, শম্ভু চন্দ্রের অনেক আগে কাকিনায় ছাপাখান স্থাপিত হয়েছিল। শম্ভু আমলে তা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। শম্ভুচন্দ্রে সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পর্কে পৃথক দু'টি নিবন্ধ রয়েছে।
রাজা মহিমারঞ্জন এক উঁচু মাপের কবি ছিলেন। তার সাহিত্য কর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা। এর কোন গ্রন্থই অখন্ড পাওয়া না গেলেও তার কিছু কবিতা ও লেখার সন্ধান মিলেছে। তার একটি কবিতা স্মরণিকায় মুদ্রিত হয়েছে।
কবি শেখ ফজলল করিম-এর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পৃথক একটি গবেষণমূলক নিবন্ধ রয়েছে।

বনীজ মহাম্মদ- জন্ম কাকিনার গোপাল রায়। তিনি ইমাম সাগর নামে একখানি পুঁথি রচনা করেন। এখন থেকে ১৪১ বছর আগে ১২৭৫ বাংলা সালে শম্ভু চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর ৬ বছর পর এই পুঁথি প্রকাশিত হয়। তবে, লেখকের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি।
তবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, রংপুর গণগ্রন্থাগারে খোঁজ করে সম্পূর্ণ পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।
এ প্রসঙ্গে রংপুর সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে ১৯৫৬-১৯৬৫ পর্যন্ত লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালনকারী মতিউর রহমান বসনিয়া জানান, সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরিতে বনীজ মুহাম্মদের পুঁথিখানি সংগ্রহে ছিল। পুঁথির ভিত্তিতে একটি পালাও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও পান্ডুলিপির সঙ্গে এই পুঁথিখানিও হারিয়ে যায়।
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। ২০৭ পাতার এই পুঁথির কিছু অংশ সাহিত্য বিশারদের গ্রন্থ থেকে তুলে দেয়া হলো।

করিনু সাইরি পুতি (পুথি) বড়ই মুস্কিলে।
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিনা সংসারে।।
বাঙ্গালা জবানে নাঞী পুতি এমামের।
তাহাতে করিনু সেকি (?) কর বরাবর।।
বারসোএ পচাত্তর মঞ্জিলের পরে দিন।
তামাম হইল পুতি জানিবে মমিন।।
ইমাম হুছনের পুতি হোইল তামাম।
গোমানিন (?) হৈল রচিলো কবি জানিবে এছলাম।
গোলামি কহেন ভাবি নবির পদ সার।
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর।।
ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন।
আল্লা আল্লা বোল ভাই 'দীনের' মোসলমান।।
তোমার কদমে ছালাম জতো কিছু ভার।
বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার।।

য়াকর (আখর) বেশি কমি হৈলে না ধরিবা আর।
গুণা খাতা মাফ করি লইবা আমার।।
পুতি সমাপ্তন হৈল (রোজ) মঙ্গলবার।
সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (?) বৈশাখ মাস জানিবা।।

ড. মোজাম্মেল হক :

ড. মোজাম্মেল হক ১৯৪০ সালে লালমনিরহাট জেলার কাকিনায় জন্মগ্রহণ করেন। কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে মেট্রিকুলেশন এবং পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ এমএ পাশ করেন। ১৯৭২ সালে গণ্ডাসগো বিশ্বাবিদ্যায় থেকে এমলিট ও ১৯৭৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ কেরন।

তিনি আন্ড়র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন অর্থনীতিবিদ। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা কাজের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণা কর্মের মধ্যে রয়েছে

Dr. Mozammel Huq Authored and edited Books/ Teaching Manual:

Development Economics, McGraw- Hill-2009, M M Huq, Cluries Ross and D. Frosyth.

Building Technologiucal Capability: Issues ad Prospects- Nepal, Bangladesh and India, University Press Ltd. Dhaka-2003, M M Huq (ed), (2003).

Technology and Development in the New Millennium. Proceedings of an international conferecne, organised by the University of Karachi jointly with the Third World STD Forum. Karachi University Press, Karachi, M M Huq (Chief Editor) (2003).

Strategies for Industrialisation: The Case of Bangladesh, University Press Ltd. Dhaka, M M Huq and J Love (2000), second impresion-2001.

Public Sector Finance in Developing Countries, Department of Accounting Finance, University of Strathclyde, Glasgow, (Teaching Manual, mimeo)-1997, Cluries Ross and M M Huq (1997).

Bangladesh: Strategies for Development, University Press Ltd. Dhaka-1995 jointly with R Grieve.
Technology and developing Countries, Frank Cass, London,R Heeks, M M Huq et al (eds) (1995).

Machinery Manufacturing in Bangladesh: An Industry study with Particular Reference to Choice of Technology, University Press Ltd. Dhaka, M M Huq, K M N Islam and N Islam (1993).

Science, Technology and Development: North-South Cooperation, Frank Cass, London, M M Huq (Chief Editor) (1991).

Chice of Technology: Leather Manufacturing in Bangladesh, Universityh Press Ltd. Dhaka, M M Huq and K M N Islam (1990).

The Economy of Ghana: The First 25 Years since Independence, Macmillan, London- M M Huq 1989.

Machine Toll Production in Developing Countries, Socttish Academic Press, Edinburgh, M M Huq and C C Prendergast (1983).

Choice of Technique in Leather Manufacture, Scottish Academic Press, Edinburgh, M M Huq and H Aragaw (1981).

তিনি বিভিন্ন আন্ড়র্জাতি জার্নালের নিয়মিত লেখক।
ড. মোজাম্মেল হক উত্তর বাংলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে অনার্স কলেজে উন্নীত এই বিদ্যাপীঠ এরতদঞ্চলের একটি খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি এলাকায় বয়স্ক শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। ডা. মোজাম্মেল হক কাকিনা মহিমা রঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কাকিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য।

শামসুল হক

লেখক ১৯৫১ সালে অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। তিনি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন। তিনি সাংবাদিক ও শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। কাকিনার পরিবেশকে ঘিরে 'নয় ছয়' নামে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়।
নদীর নাম তিস্ড়া, প্যাপিরাস, বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে মুসলিম চরিত্র, আধুনিক জগৎ ও মানববিজ্ঞানসহ আরো অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়াও তিনি শিশুতোষ ও রূপ কথার গ্রন্থ রচনা এবং অনুবাদ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

কবিতা

১। নাচিতেছে হরগণ
বীরগণে দিতে আলিঙ্গন
চিরসাম্য ফেরদৌস
নন্দন কাননে
খবর এসেছে
তৌরাত ইঞ্জিল
কোরানে

২। ভূভেদী বোরাকের সিনি আরোহী
সুময় আকাশ তাকিয়া যাহার
যেথায় যেতে জিব্রল ও অক্ষম
পবিত্র সেই দেশ তাপসে
বিভূ বলে সখা কি
নিয়া আসিছ হেথায়
রসুল বলল- আত্তাহিয়াতু
লিল-াহি ওয়াস সালাওয়াতু
ওয়াত্তাইয়াবাতু-

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গিরিজা শংকর রায় বিএল মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির প্রতি

তাঁকে বলা হতো তিন পুরুষের হেডমাস্টার। আরো বলা হতো যে ছাত্রের চেয়ে অভিভাবকরাই তাকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। এই ঋষিপ্রবর স্বর্গীয় গিরিজা শংকর রায় বিএল মহাশয় ছিলেন কাকিনা মহিমারঞ্জন মেমেরিয়াল হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।

সঠিকভাবে জানা না গেলেও ১৯১১ থেকে ১২ সালের মধ্যে তিনি প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তবে এর আগে থেকেই তিনি এ স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়েজিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের ২১ মে রজত জয়ন্তী'র আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

আপন মহিমায় মহিমান্বিত এই মহান শিক্ষাগুরু সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি ততটুকুই এ নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি ছাত্রদের খোঁজ নিতেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রী ক্লাশে ভাল করতে না পারলে তিনি তার বাড়িতে গিয়ে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে আসতেন। ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে তিনি সব সময় অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতেন ও যোগাযোগ রাখতেন। সে সময় কাকিনা হাইস্কুলের অন্য শিক্ষকরাও তার এই আদর্শের অনুসারী ছিলেন।

স্যার মাঝে মাঝে বাজারে আসতেন। কোন ছাত্রকে বাজারে চোখে পড়লে ওই ছাত্রের অভিভাবকের কাছে তিনি নিজে নালিশ করতেন এবং পরদিন স্কুলে ছাত্রটিকেও সতর্ক করে দিতেন।

একবার ভোটমারীতে কাকিনা হাই স্কুলের টিম ফুটবল খেলতে গিয়েছে। এক অপ্রীতিকর ঘটনায় একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে লালমনিরহাট নিয়ে যায়। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাফলার গলায় ঝুলিয়ে হেঁটে কাকিনা স্টেশন থেকে মালগাড়িতে চেপে তিনি লালমনিরহাট গিয়ে ওই ছাত্রটিকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

দশম শ্রেণীতে তিনি ইংরেজি পড়াতেন। ভূগোলের শিক্ষকও ছিলেন তিনি। স্কুল আসতেন সবার আগে যেতেন সবার শেষে। স্কুল শেষে কিছু ফাইলপত্র ও বই পুস্তক ঝুঁড়িতে করে নিয়ে একজন দফতরি তার পিছন পিছন হেঁটে তার বাসায় পৌঁছে দিত। শম্ভু সাগরের পশ্চিমেই ছিল তার বাসা। ঘুম থেকে ভোরে উঠতেন। স্কুলের প্রশাসনিক কাজ সেরে নিজে লেখাপড়ায় বসতেন।

লেখাপড়া, খেলাধুলা, মিলাদ, পূজা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা ও প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক তথা সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনে তিনি ছিলেন যত্নবান। কোন ছাত্র কোন কিছুতে ভাল করলে প্রাণ উজাড় করে তিনি তাকে উৎসাহ ও সাহস যোগাতেন।

একবার কাকিনা মাঠে গুর্খা টিমের সঙ্গে কাকিনা হাইস্কুলের ফুটবল খেলা চলছে। কোনভাবে গোল হচ্ছে না। দু'দলই তুখোড় খেলছে। খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে এমন সময় নূরুজ্জামান কেচু ব্যাক ভলি মেরে একটি গোল করে ফেললেন। আর যায় কোথায়! মুহূর্তেই গিরিজা শংকর মহাশয় চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গায়ের চাদর খুলে ঘুরাতে ঘুরাতে গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন 'সাবাস ব্যাটা- লাখ টাকার মার মেরেছিস।

তিনি একজন লজিং মাস্টারও ছিলেন। তার বাসায় লজিং থেকে লেখাপড়া করেছেন এমন একজন কৃতি ছাত্র হচ্ছেন যোগেন্দ্র মোহন রায়। তিনি ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ২০তম স্থান অধিকার করেন।

অন্যায়ের শাস্তিতে তিনি ছিলেন কঠোর। একবার এক ছাত্র এক মেয়ের সীটের নিচে ৩টি লবঙ্গ কাগজে পুটলি করে রেখে দেয়। এ কথা শুনে হেড মাস্টার মহাশয় নিজে বেত হাতে কাঁপতে কাঁপতে ক্লাশে এসে ওই ছাত্রকে বেদম শাস্তি দেন। এরপর তিনি ক্লাশের অন্য ছাত্রদের বললেন, আমার শাস্তি আমি দিলাম, এখন তোমরা কি শাস্তি দিবে তা ঠিক করো।

সে সময় সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রোবাবর। শুক্রবারও ক্লাস হতো। জুমার নামাজের জন্য শুক্রবার টিফিন পিরিয়ডের সময় ২৫ মিনিটের পরিবর্তে এক ঘণ্টা ছিল। স্কুলের একজন মুসলমান শিক্ষকের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্ররা স্কুলের পিছনের মসজিদে (তেলিটারী মসজিদ) নামাজ পড়তে যেত। কোন ছাত্র নামাজ পড়তে গেল কিনা এ ব্যাপারেও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। আবার পূজার সময় স্বরস্বতী দেবীর আসন ঠিক আছে কিনা সেটাও তার নজর এড়াতো না। সেময় তাঁর এ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি কাকিনার সংস্কারবিহীন সার্বজনীনতাকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

এই মহান শিক্ষা গুরুর প্রতি ছাত্রদের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এর একটি ঘটনা হচ্ছে- জনাব মোঃ আমিন সে সময় রংপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। জীপে করে তিনি স্কুলের দিকে আসছেন। স্কুলের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়লো প্রধান শিক্ষক মহাশয় এদিকেই আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে জীপ থামিয়ে দ্রুত নেমে গুরুদেবের সামনে গিয়ে প্রথমে তাঁকে সালাম করলেন। জনাব মোঃ আমিন কাকিনা হাই স্কুলের একজন কৃর্তি ছাত্র। ১৯১৯ সালে তিনি কৃর্তিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন। তার এই কৃর্তিত্বের জন্য তিনি বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

স্বর্গীয় কান্তেশ্বর বর্মন মহাশয়ের জীবন থেকে পাওয়া দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করছি। কান্তেশ্বর বর্মন মহাশয়ের বাড়ি ছিল বর্তমান আদিতমারী থানার সারপুকুর ইউনিয়নে। তিনি ১৯১৫ সালে কাকিনা মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল হাই ইংলিশ থেকে কৃর্তিত্বের সঙ্গে এনট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য (এমএলএ) ছিলেন। শিক্ষা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তিনি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভাদাই গিরিজা শংকর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়। বর্তমান আদিতমারী গিরিজা শংকর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়।

তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ডেওডোবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমরীর হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় (বর্তমান কুমরীর হাট হাই উচ্চ বিদ্যালয়) ও হরিদাস প্রাথমিক বিদ্যালয় (বর্তমান হরিদাস উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিন্নাগাড়ী খাল খননসহ বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তিনি কাকিনা রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরীর প্রতিনিধি হিসেবে ও কাকিনা স্টেটের বৃত্তি লাভ করে কলিকাতা সেন্ট পলস কলেজে ভর্তি হন। সে সময় ওই কলেজে শুধুমাত্র উচ্চ পদস্থ খৃস্টান কর্মকর্তা, মিশনারী এবং রাজা ও জমিদারদের সন্তান ছাড়া অন্য কারো ভর্তির সুযোগ ছিল না

শিক্ষাগুরুর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কান্তেশ্বর মহাশয় লিখেছেন যে, 'ভিন্ন ইউনিয়নবাসী হইলেও আমি ভাদাই ইউনিয়নের সুখ, দুঃখ, মঙ্গলা মঙ্গলের বিষয় সর্বদা চিন্তা করি এবং তাহার উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট। আমি গর্ব অনুভব করি যে, ভাদাই ইউনিয়নবাসী প্রত্যেকেই আমাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য স্নেহ করেন ও ভালবাসেন। এই সাহসে আশান্বিত হইয়া আমি প্রথমেই ভাদাই ইউনিয়নে 'ভাদাই গিরিজা শংকর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় খুলিতে সাহস করি। যে নীরব কর্মী ঋষি প্রবর ত্রিশ বছরের অধিককাল কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের কর্ণধার পদে উত্তরবঙ্গে জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন, তাঁহারই পবিত্র নামে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হইল।' ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘ (২৩ জানুয়ারি, ১৯৪২) থেকে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়।

একজনমহৎ প্রাণ শিক্ষক তাঁর ছাত্রের জীবন জগৎকে কতটা প্রভাবিত ও আলোড়িত করতে পারে তার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন শংকর রায় মহাশয়। এই মহান শিক্ষাগুরুর শিক্ষকতার ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত রজত জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্যে কান্তেশ্বর মহাশয় লিখেছিলেন-

গুরুদেব,

'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' - জীবনে ক্লান্তিতে, গ্লানিতে, অবসাদে হৃদয় ও মন যখন ভরে যায়, তখন ছুটে যাই তোমার পদপ্রান্তে.....শুভ্রতায়, পবিত্রতায়, সৌন্দর্যে হৃদয় ও মন আমার ভরে ওঠে। ক্লান্তি, গ্লানি, অবসাদ দূর হয়ে যায়। নতুন শক্তিতে প্রেরণায় আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

হে আচার্য দেব। তোমার পদপ্রান্তে বসবার আমার এ সুযোগ অজীবন অটুট থাকুক।

সেবকাধম

শ্রী কান্তেশ্বর দাশ

কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, অত্র বিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির পক্ষে নিবেদিত হলো এই শ্রদ্ধাঞ্জলী।

এই নিবন্ধ রচনায় তথ্য সহায়তা প্রদানকারীগণের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি-

১। আলহাজ মোঃ মজিবর রহমান এমপি

২। ড. যোগেন্দ্র মোহন রায়

৩। অধ্যাপক আবদুস সালাম

৪। বিনতা রায় দেব অধিকারী।

কবিতা

মহিমারঞ্জন

কোথা ব্যাবিলন নিনিভা এখন
প্রধান নগরীদ্বয়।
দিনে দিনে তারা হয়ে শোভা হারা
ভূমিতে হয়েছে লয়॥
অনিতা সকল ধন-মান-বল,
জীবন-যৌবন-দেহ।
সুন্দর নগর অতি মনোহর
মণিতে খচিত গেহ॥
ইতিহাস পড়ি মনে মনে করি
সকলি হয়েছে কাল।
ভেবে বা কি করি কোন গুণে তার
ঘিরেছে মায়ার জাল॥

সম্প্রীতি

কাকিনার দীর্ঘদিনের সংস্কৃতির মূলশক্তি হচ্ছে এর সম্প্রীতি। কাকিনা জমিদারদের আড়াইশ' বছর ও এর পরবর্তী প্রায় শত বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সম্প্রীতি বিনাশী আঘাত এসেছিল, তবে কাকিনার মানুষ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করেছে।

কাকিনার জমিদার দরবারে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের মানুষের ছিল অবাধ যাতাযত। রাজ কার্যেও সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহনও ছিল স্বতস্ফুত। জমিদারী আমলেই কাকিনার সম্প্রীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল । আর এই সম্প্রীতিকে সার্বজনীন করে তুললেন কবি শেখ ফজলল করিম। আর এ জন্য হয়তো দেখা যাবে কাব্যিক এই কাকিনার সব বাড়ীর সঙ্গে ছোট হোক বড় হোক একটি হলেও পুকুর আছে। বাগান না থাকুক দু'চারটা ফুল গাছ সব বাড়ীতেই দেখা যাবে।

কবি শেখ ফজলল করিম

রাজা মহিমা রঞ্জন রায়